ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 20, No. 2, December 2023

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 20, No. 2, December 2023

'Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas' is a bilingual multidisciplinary **peer reviewed** journal published biannually in June and December since 2003.

- Official journal of the Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India.
- Covers key disciplines of Humanities and Social Sciences like Economics, Political Science, Sociology, Demography, Development studies, Literature as well as Commerce & Management.
- Open to original research articles as well as scholarly review papers.
- Strives to bring new research insights into the process of development from an interdisciplinary perspective.
- Prospective authors will have to follow styles mentioned in the 'Journal Guidelines' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website.

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Tapodhir Bhattacharya, Eminent Author & Ex-Vice Chancelor, Assam University

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty, Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata & Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay, Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das, Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Samirranjan Adhikari, Department of Education, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman, Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Professor (Dr.) Biswajit Mohapatra, Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Professor (Dr.) Paramita Saha, Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Professor (Dr.) Prasad Serasinghe, Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Editor-in-Chief :

Dr. Dipankar Ghosh

Executive Editors :

Dr. Bhabesh Majumder (bmsrlm.100@gmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty (shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

রঙ্গালয়ে বঙ্কিম উপন্যাস

অমলচন্দ্র সরকার ৩

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প : প্রকৃতি ও মানবমনের বহুমাত্রিক মেলবন্ধন

শিউলি বসাক ১০

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার পাঠকের দর্পণে

পাপ্পুসোনা গান্ধী ২২

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প : পরিবেশ ভাবনার নিবিড় পাঠ

রাখিমা দাস ২৯

প্রফুল্ল রায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিবর্তিত সমাজ ও মূল্যবোধের রূপায়ণ

মাধবী বিশ্বাস ৩৬

মহেশপুরের শোলাশিল্প : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক আলোচনা

পৌলোমী রায় ৪৩

পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া নারী সমাজ : একটি সমীক্ষা

দীপাঞ্জন দে ৪৮

Harmonizing Two Horizons : Literature and Medicine in Poetry of John Keats

Yogesh S. Kashikar ৫৫

OPEN EYES

রঙ্গালয়ে বঙ্কিম উপন্যাস

অমলচন্দ্র সরকার

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা, মঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয় শিল্পে অসাধারণ দক্ষতা একমাত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষই দেখিয়েছিলেন। তাই তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার, সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও পরিচালক হিসেবেই গণ্য করা হতো। ''এই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে গিরিশচন্দ্র বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় অম্লান তেজে আমৃত্যু বিরাজ করিয়াছিল।''[১] সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতি রচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সাধনায় তিনি ব্রতী হন। প্রথম জীবনে ঈশ্বরগুপ্তকে আদর্শ মেনে কাব্যচর্চা শুরু করলেও বাংলার প্রাচীন যাত্রাগানই তাঁকে প্রেরণা যোগায় নাট্যরচনায়। তিনি মনে করতেন যাত্রা ও নাটক সমগোত্রীয়। তিনি বলেছিলেন যারা এই যাত্রাকে থিয়েটারের সঙ্গে প্রভেদ করেন তারা হয়ত জানতেন না যে, শেক্সপিয়র, বেন জনসন প্রভৃতি মহাকবির সব নাটক প্রথমে যাত্রাপালার ন্যায় অভিনীত হত। গিরিশচন্দ্র যাত্রাপালা যে নাটকেরই একটি উপ-শাখার অন্তর্ভুক্ত তা মেনেই তিনি প্রথম জীবনে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটিকে যাত্রাপালায় রূপান্তরিত করে সমকালীন যাত্রাগানে যে কুরুচিপূর্ণ বিষয়গুলি প্রভাবিত হয়, সেইসব জঘন্য কুরুচিপূর্ণ প্রভাব দূরীকরণে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটিকেই নির্বাচন করেন যাত্রাপালার মূল বিষয় হিসাবে।

গিরিশচন্দ্র বাঙালি দর্শকের মানসিকতা বিচার করে নাটক রচনায় আগ্রহী হন। দর্শকের দাবিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন তিনি। তাই যাত্রা, কথকতা ও হাফ আখড়াইয়ের শ্রোতাদের দেখে নাটক লিখতে হয় বলে মনে করেছিলেন। দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে গেলে পৌরাণিক নাটক অবলম্বন করতে হবে—এই মানসিকতার কারণে তিনি তাঁর নাট্যরচনার প্রয়াসকে পুরাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। বাগবাজার সখের যাত্রায় তাঁর নাট্যজীবনের সূচনা এবং দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর বাংলার নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাংলা নাট্যমঞ্চের সেবা করেছিলেন। আবার নাট্যমঞ্চের চাহিদা পূরণেই নাটক রচনায় ব্রতী হন। তিনি নট হিসেবেই নাট্যমঞ্চের পাদপ্রদীপে এলেও পরবর্তীকালে তাঁকে নাট্যকারের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের গোটা সাহিত্যকর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—বিষয়বস্তু পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক যাইহোক না কেন সেগুলি মূলত মনুষ্য সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দীর্ঘ নট ও নাট্যকার জীবনে বহু মঞ্চসফল নাটক তাঁকে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। গিরিশচন্দ্র সফল মৌলিক নাটক রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও তাঁকে বাংলা উপন্যাসের কাহিনী বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কাহিনী নাটকে রূপান্তরিত করে বাংলা নাট্যমঞ্চে এক অনবদ্য ধারার প্রবর্তন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা নাট্যমঞ্চকে যেমন পুষ্টিদান করেছে তেমনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপন্যাসের কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করে বঙ্কিম উপন্যাসের কালজয়ী রোমান্টিক ও রোমান্সধর্মী রচনাকে বাংলা নাট্যমঞ্চে প্রতিস্থাপন করে যে কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন তা এককথায় বাংলা সাধারণ নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে মাইলস্টোন বিশেষ; তাই তাঁকে নাট্যশালা তৈরি

সরকার, অমলচন্দ্র : রঙ্গালয়ে বঙ্কিম উপন্যাস
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 2, Dec 2023, Pages : 3-9, ISSN 2249-4332

করতে গিয়ে রথ ও পথ দুইই নির্মাণ করতে হয়েছে।

> ''.... কেবল কল্পনার বিলাস-বিভ্রম নহে, পরন্তু লেখকের অন্তঃকরণের গভীর স্তরে যে তাহাদের মূল আছে, আমাদের স্বতঃই এই রূপ প্রতীতি করে। এই নিগূঢ় সৌন্দর্যের আলোকে প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে অথচ উপন্যাসোচিত বাস্তবতার সীমা লঙঘন করে নাই। এই ক্ষুদ্র বর্ণনাতেই তাঁহার কল্পনা শক্তির ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজটি পাওয়া যায়।''[২]

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলার নাট্যশালাকে জনমুখী করে তুলতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অপরদিকে তিনি বাংলার উপন্যাসের কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করে বাংলা নাট্যমঞ্চকে এক নতুন আলোক দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছেন। বিশেষ করে বঙ্কিমের উপন্যাস তাঁকে বেশি করে অনুপ্রাণিত করেছে। শিক্ষিত পাঠক বঙ্কিমের উপন্যাসের রসাস্বাদন করে যেমন বিস্মিত হয়েছেন তেমনি তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপেও মুগ্ধ হয়েছেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ নানা মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে অনেক মৌলিক নাটক রচনা করেছেন এবং বঙ্কিম উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তেরটি উপন্যাসের মধ্যে দশটি উপন্যাস তিনি নাট্যরূপ দান করেন। গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমৃতলালের গৌরবের কালে বঙ্কিমের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। দীনবন্ধু মিত্রের রচিত নাটকের পর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ সব নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বিবরণ থেকে জানা যায়—মানবের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও অন্তরের পরস্পর বিরোধীভাবের দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই নাট্যকলার বিরাট স্ফূরণ ঘটেছে।

> ''ইতিহাস ও পুরাণের নিয়তিতাড়িত নায়ক-নায়িকা কিংবা চরিত্রগত অতিরেক অথবা বিচ্যুতির কারণে বিপর্যস্ত রাজন্য তথা অভিজাতবর্গ আধুনিক ট্র্যাজেডির মনন ও নির্মাণে আর দৃশ্যমান নন। তাঁদের জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় সাধারণ অনভিজাত, হয়তো বা দুর্বল ও খণ্ডিত মানুষকে, যাদের প্রথাগতভাবে নায়ক চরিত্র না বলে অ্যান্টি-হিরো বলাই যুক্তিসংগত। দুঃখ-বেদনা-বিপর্যয়-বিনাশ মানবজীবনের অপরিহার্য অভিজ্ঞতা। জীবন ও অস্তিত্বের এই অপরিহার্যতার উপলব্ধি থেকেই নাটকের জন্ম। .... সামাজিক অর্থনৈতিক দমন পীড়ন আধিপত্যের বেড়াজালে আবদ্ধ অসহায় সাধারণ নর-নারী সেই নাটকের পাত্র-পাত্রী।''[৩]

এই সমস্ত উপকরণ উপাদান ও দৃশ্যাবলী বঙ্কিম-উপন্যাসে অধিক পরিমাণে থাকায় রূপান্তরিত নাটক দর্শকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র নাটক নিজে না লিখলেও তাঁর রচিত উপন্যাসে যে নাট্যিক উপাদান যথেষ্ট মাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর রচিত 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসকে নাট্যরূপে রূপান্তরিত করেছিলেন কেবলমাত্র নাটকীয় গাম্ভীর্যগুণে। ভীমাদর্শন কাপালিক প্রকৃতিপালিতা সরলতার প্রতিমূর্তি মৃণ্ময়ী প্রেম-পিপাসিতা তেজস্বিনী নারী প্রকৃষ্ট নাটকীয় চরিত্র। যে কারণে নাটকাকারে রূপান্তরিত কপালকুণ্ডলা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক বলেই অনেক সমালোচক মনে করে থাকেন। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয় তার অনেক দিন পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়। 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছরেই। তখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস জনাদৃত হয়নি। অমৃতলাল বসুর কথায় জানা যায় দীনবন্ধুর

রচিত নাটকের জন্য সাধারণ দর্শক অপেক্ষা করলেও বঙ্কিমের উপন্যাসের জন্য কেউ ততটা আগ্রহ প্রকাশ করত না। তবে বঙ্গদর্শনে যখন 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে লাগল তখন থেকেই বঙ্কিম-উপন্যাস সকলের হৃদয় জুড়ে বসেছিল। অমৃতলাল বসুর মতো নাট্যব্যক্তিত্বই নয়, কিশোর রবীন্দ্রনাথও বিষবৃক্ষ পাঠে মুগ্ধ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই বাংলা সাহিত্যে রোমান্সের সূচনা করে। কেবল রসভোগেই নিবিড় আনন্দ হয়। তাঁর লেখার মধ্যে নীতিশিক্ষাও রয়েছে। মনুষ্য সমাজকে উন্নত করার প্রধান উপায় প্রণয়। ভালোবাসাতেই মানুষের নির্মল-অবিনশ্বর সুখ জন্মায়। ভালোবাসাতেই সমগ্র সমাজের উন্নতি হয়। যিনি শোককে পবিত্র ও নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসতে শেখাতে পারেন তিনি একজন প্রধান শিক্ষক ও মঙ্গলদাতা; সেই সঙ্গে মানব জাতির পরম বন্ধু। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সকল পাঠক পরম বন্ধু ও শিক্ষক বলে মনে করতেন। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষ এবং অভিনেতারা বঙ্কিম-উপন্যাসে পাঠকের আনন্দ ও কৌতূহল দেখে তা নাটকে রূপান্তরিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

> ''নাটকে একটি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকারকে তাঁর উপযোগী বিশিষ্ট বাগভঙ্গির আশ্রয় নিতে হয়।''[৪]

শুধু তাই নয়—

> ''প্রত্যক্ষ জীবনচেতনাকেই নাটকের মধ্যে হাজির করা হয়, উদ্ভট কোনো কল্পনার স্থান নেই, বাস্তব জীবনেরই সমান্তরাল কোন জীবনের প্রতিচ্ছায়া আমরা নাটকে দেখি। তাই নাটক মানব জীবনের প্র্যাত্যহিক বেদনার বাঙ্ময় ও উচ্চকিত রূপায়ন।''[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রায়ই ড্রামাটিক এবং ড্রামাটিক বলেই অভিনেতা অভিনেত্রীর পক্ষে রসবিকাশের অনুকূল। মনস্তত্ত্বের অপূর্ব বিশ্লেষণ এতে প্রস্ফুটিত হয়। ধারাবাহিক ঘটনাবলী অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে সঞ্জাত এবং হৃদয়যন্ত্রের তরঙ্গভঙ্গের স্বাভাবিক গতিতে সদা নীলাচঞ্চল। বেঙ্গলি থিয়েটারে মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি অভিনীত হওয়ার পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৩ সালের ১০ই অক্টোবর অভিনীত দুর্গেশনন্দিনীতে যারা অভিনয় করেন তারা হলেন—বিমলা, সুকুমারী দত্ত, ওসমান-হরিদাস দাস, অভিরাম স্বামী-বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, জগৎ সিংহ-শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রীগণ। ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেওয়ার পর মৃণালিনী অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেন এবং মঞ্চস্থ করেন, বিশেষ করে সুকুমারী দত্তের গানই ছিল আকর্ষণের মূল বিষয়। গানের টানেই মঞ্চে দর্শক সমাগত হত অধিকমাত্রায়। এছাড়া পশুপতির ভূমিকায় কিরণবাবুর অভিনয় সাড়া ফেলে দিয়েছিল দর্শক-হৃদয়ে।

১৮৭৭ সালে 'মৃণালিনী' বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। ভূমিকালিপি এরকম ছিল—পশুপতি - কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবাচার্য - বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, মৃণালিনী - বনবিহারিণী (ভূণী), গিরিজায়া - সুকুমারী দত্ত, মনোরমা - বিনোদিনী। এ নাটকে বিনোদিনীর অভিনয়, সুকুমারীর সঙ্গীত ও বিহারীলালের চরিত্র রূপায়ন বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। বিমলা ও গিরিজায়ার ভূমিকায় সুকুমারীর অভিনয় দেখে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—''আজ বিমলা গিরিজায়াকে জীবন্ত দেখিলাম।''[৬]

ক্লাসিক থিয়েটারে ১৯০১ সালে গিরিশচন্দ্রের ঐ নাট্যরূপায়ন পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। এ অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অঘোরনাথ পাঠক ও কৃষ্ণকুমারী যথাক্রমে পশুপতি, হেমচন্দ্র, হৃষিকেশ ও গিরিজায়ার ভূমিকায়

অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অভিনয়-রজনীতে অগ্নিকাণ্ড দেখবার সময় পশুপতিরূপী গিরিশচন্দ্রের মাথায় স্থানে স্থানে পুড়ে যায়। এরপর গিরিশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকায় অভিনয় করতে চাইতেন না। তার জায়গায় দীনবন্ধু নামতেন।

স্টার থিয়েটারে আবার মৃণালিনী মঞ্চস্থ হয়। পশুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। রঙ্গমঞ্চে 'মৃণালিনী' নাটক স্মরণীয় হয়ে আছে প্রধানত পশুপতি চরিত্রের জন্য।

> ''পশুপতি দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। কিন্তু তাঁর অনুতাপ, আত্মগ্লানি, উন্মত্ততা, বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে নাটকীয় উপাদান সবচেয়ে বেশী রয়েছে এবং রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ এই ভূমিকায় নেমে তাদের অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রঙ্গমঞ্চে বিরূপ বিপরীত বিরোধী চরিত্রগুলি বেশী আকর্ষণীয়। রাবণ, বৃত্রাসুর, কংস চিরকালই রঙ্গমঞ্চে রাজত্ব করেছে। পশুপতি ও গিরিজায়া এই দুটি হল মৃণালিনীর সবচেয়ে নাট্য রসোদ্দীপক চরিত্র। পশুপতিকে গিরিশচন্দ্র যেমন অমর করে গেছেন, গিরিজায়া তেমনি জীবন্ত হয়ে রয়েছে সুকুমারী ও কুসুমকুমারীর অভিনয়ে।''[৭]

মৃণালিনীতে বিনোদিনীর অভিনয় সেকালের দর্শক সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। মৃণালিনীতে মনোরমার অভিনয়ে বিনোদিনীর অভিনয় যে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল যথার্থই যারা বিনোদিনীর অভিনয় দেখেছেন জীবনে কখনো ভুলবে না। এ রকমই ছিল গিরিশচন্দ্রের অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। এর কাহিনী সামাজিক বলে এতে চমক ও নাট্যগতি কিছুটা ধীর ছিল। এর অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র, রামতারণ সান্যাল, মহেন্দ্রলাল বসু, কাদম্বিনী ও বিনোদিনী যথাক্রমে নগেন্দ্র, শ্রীশ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিনয় ন্যাশনালের খ্যাতি আরো বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। 'বিষবৃক্ষ' বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। নগেন্দ্র সূর্যমুখী, শ্রীশ ও কমলমণির ভূমিকায় যথাক্রমে মহেন্দ্রলাল বসু, সুকুমারী, হরি বৈষ্ণব ও প্রমদাসুন্দরী অভিনয় করেন। পুনরায় আবার অভিনীত হয় এমারেণ্ড থিয়েটারে, নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র। স্টারে 'বিষবৃক্ষ' আবার অভিনীত হয়। তারাসুন্দরী সূর্যমুখীর ভূমিকায় এবং সুশীলাসুন্দরী কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ঐ থিয়েটারে বিষবৃক্ষ মঞ্চস্থ হলে অহীন্দ্র চৌধুরী নগেন্দ্রর ভূমিকায় অভিনয় করেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি নাট্যরূপ দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। নাটকে চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় - বিহারীলাল, প্রতাপ - হরি বৈষ্ণব, ফস্টর - শরৎচন্দ্র ঘোষ, দলনী - বনবিহারিণী প্রভৃতি চরিত্রগুলি নাট্যিক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বিশেষ সাফল্যে পৌঁছে দিয়েছিল। এই নাটকটি পুনরায় স্টার থিয়েটারে অমৃতলাল বসু নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেন। অমৃতলাল বসুর ফস্টর ও নরীসুন্দরীর দলনীও অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। অপরেশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> ''সুকণ্ঠ অমৃতলালের চন্দ্রশেখরের সেই হৃদয়বেদী করুণ বিলাপ, সনাতন, আবার সংসারে? যেন তখনও কর্ণে ঝঙ্কার তুলিতেছে।''[৮]

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টার থিয়েটারে যোগদান করে এই নাটককে আবার অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। নাটকের পাত্রপাত্রী ছিলেন চন্দ্রশেখর - অমৃতলাল বসু, প্রতাপ - অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শৈবালিনী - কুসুমকুমারী, দলনী - নরীসুন্দরী। এই নাটকটি মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়। দানীবাবু ও আশ্চার্যময়ী প্রতাপ ও দলনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং নির্মলেন্দু লাহিড়ীর নবাব চরিত্রের অভিনয় তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। গিরিশচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ করে নিজে চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 'রজনী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। নাটকের ভূমিকার যারা অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন—শচীন্দ্র - মহেন্দ্রলাল বসু, অমরনাথ - হরি বৈষ্ণব, রজনী - সুকুমারী দত্ত, লবঙ্গলতা - নিস্তারিণী। নাটকে প্রত্যেকেই অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি নাট্যরূপ দিয়ে নাটকটিকে এমারেল্ড থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, সুকুমারী দত্ত যথাক্রমে গোবিন্দলাল, হরলাল ও রোহিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে নাটকটিকে সাফল্যের দিগন্তে পৌঁছে দেন। পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটিকে 'ভ্রমর' নামে নাট্যরূপ দিয়ে ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকে কৃষ্ণকান্ত - মহেন্দ্রলাল বসু, গোবিন্দলাল - অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নিশাকর - সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), ভ্রমণ - সুকুমারী, রোহিনী - প্রমদাসুন্দরী দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে ভ্রমর একজন আদর্শ নারী। কিন্তু নাট্যিক দিক দিয়ে বিচার করলে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বের সজীব ও নাটকীয় চরিত্র হল রোহিনী। এমারেল্ড থিয়েটারে রোহিনীর উপর গুরুত্ব দিলেও ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ভ্রমর চরিত্রকেই বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অমৃতলাল বসু 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে খুব দক্ষতার সঙ্গে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেছিলেন। অমৃতলাল বসু - রাজসিংহ, নরীসুন্দরী - দরিয়ার ভূমিকার দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। বেঙ্গল থিয়েটারে নাটকটি পরপর সাত রাত্রি মঞ্চস্থ করা হয়। কেদারনাথ চৌধুরী 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। অর্ধেন্দুশেখর মহাপুরুষের ভূমিকায়, জীবানন্দ - কেদার চৌধুরী, মহেন্দ্র - মহেন্দ্রলাল বসু, শান্তি - বনবিহারিণী, সত্যানন্দ - মতিলাল সুর প্রভৃতিরা অভিনয় করেন। অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটার ও অরোরা থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। প্রখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নীলমাধব চক্রবর্তী ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। এঁরা যথাক্রমে ভবানী পাঠক ও ব্রজেশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'সীতারাম' উপন্যাসটি নাট্যরূপ দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন এবং নাটকে নতুন সংলাপ সংযোজন করেন। সীতারাম চরিত্রে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গারাম চরিত্রে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, চন্দ্রচূড় - অঘোরনাথ পাঠক, মৃণ্ময় - প্রিয়নাথ ঘোষ, শ্রী - তিনকড়ি, জয়ন্তী চরিত্রে - সুশীলাবালা। নাটকের সমাপ্তিতে দর্শক সমাজ সীতারামের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। নাটকে সুশীলাবালার গানে দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নাটকে রূপান্তরিত করেছেন অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ও বিশেষ নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটারে বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতেন। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ দেন বিহারীলাল। 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'বিষবৃক্ষ' বহুবার নাটকে রূপদান করেন অমৃতলাল বসু। 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'সীতারাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

> ''উপন্যাস পড়ে পাঠকের মনে উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র অনেক আনন্দ-বেদনা অশ্রুজলের সঙ্গে মিশে অঙ্কিত হয়ে যায়। পাঠক দর্শক হয়ে যখন থিয়েটার দেখতে আসে তখন মনের মধ্যে আঁকা সেই ছবি নিয়ে আসে। মঞ্চের ঘটনা ও চরিত্র যতই সেই ছবির অনুরূপ হয় ততই তার সন্তোষ বর্ধিত হতে থাকে। আর যদি মঞ্চের দৃশ্য সেই ছবির বিপরীত হয় তবে দর্শকের মনে অভিযোগ ও প্রতিবাদ ধূমায়িত হতে থাকে। তবে উপন্যাসের অনেক জায়গা অনুক্ত ও অস্ফুট থাকে। নাট্যকার সেই সব জায়গায় যদি মূলভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং রসের দাবি অনুযায়ী যদি ঘটনা ও

> সংলাপ কিছু সংযোজন করেন তবে তা দর্শকের দ্বারা সংবর্ধিত হয়। একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সংলাপ উন্নততর ও অধিকতর নাটকীয় করবার ক্ষমতা কারও হয়নি। যিনি মূল সংলাপের জায়গায় নিজের সংলাপ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন তিনিই ব্যর্থ হয়েছেন, তবে উপন্যাসের বিবৃতি অংশ যিনি সার্থকভাবে সংলাপে রূপায়িত করতে পেরেছেন তিনিই সফল নাট্যরূপদাতা হতে পেরেছেন। অনেক ক্ষেত্রে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে কোন ভূমিকায় কে অভিনয় করবে সেদিক লক্ষ্য রেখে।''[৯]

নাট্যরূপদাতাদের অন্যতম ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর নাট্য-রূপান্তরের মধ্যে নিজের সংলাপ প্রয়োগ করার ফলে নাট্যরূপটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। মৃণালিনীর নাট্যরূপদান ও সংলাপ প্রয়োগে তিনি এক অসাধারণ নাট্যগুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপে অভিনয় করতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের উচ্চতা-গাম্ভীর্য ,প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির প্রকাশের জন্য বলিষ্ঠতা, অঙ্গ সঞ্চালনের সক্রিয়তা থাকা দরকার যা অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। গিরিশ যুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল অভিনয়ে সুর দেওয়া যা অনেক নাট্যকারের মধ্যে ছিল। অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন সুকুমারী দত্ত, বিনোদিনী, তিনকড়ি ও তারাসুন্দরীর মতো শক্তিশালী অভিনেত্রী। পরে আর কোন দিনই নাট্যজগতে আসেনি। এরা তিনজনই অশঙ্কিনী নারীর ন্যায় চিরভাস্বর। অভিনেতাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। তাঁর জগৎসিংহ, পশুপতি, নগেন্দ্রনাথ, সীতারাম চরিত্রে অভিনয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। নায়কের ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন—গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও হরি বৈষ্ণব। এরা প্রত্যেকেই এক এক দিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসের বিষয় ভাবনা সমকালীন শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সব ধরণের দর্শকের কাছে বিপুল সমাদর পেয়েছে। ১৮৭৩ সাল থেকে শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মঞ্চস্থ হয়েছে গিরিশচন্দ্রের নাট্য রূপান্তর ও মঞ্চ পরিচালনার সুকৌশলের দ্বারা। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় বাংলা নাট্যমঞ্চে বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছিল এবং তার প্রায় অধিকাংশ কৃতিত্ব ছিল নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের। যার অবদান নাট্যসাহিত্যে আজও অনবদ্য ও চিরস্মরণীয়। বাংলার সমাজধর্ম ও রাজনীতির ভাববিহ্বল অবস্থার প্রথম যুগের বাঙালি নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সমাজের নবজাগ্রত ভাব-তরঙ্গের অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি সদাজাগ্রত, সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও পরিচালক।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বাংলা নাটকের ইতিহাস, অজিতকুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১৫৫।

২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৬৯।

৩. সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১৭৫।

৪. তদেব, পৃ. ১৫৫।

৫. বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১০১।

৬. বাংলা রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ, ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৯৫।

৭. তদেব, পৃ. ৯৫-৯৬।

৮. তদেব, পৃ. ৯৬।

৯. তদেব, পৃ. ১০১।

অমলচন্দ্র সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প : প্রকৃতি ও মানবমনের বহুমাত্রিক মেলবন্ধন

শিউলি বসাক

সারসংক্ষেপ : আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে এক নিগূঢ় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সখ্যতা ক্রমশ কমেছে, দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে। আর দূরত্ব যতই বেড়েছে, রহস্য ততই দানা বেঁধে উঠেছে। এই রহস্যময়ী প্রকৃতি তার নানা রূপ নিয়ে আমাদেরকে কখনো মুগ্ধ, কখনো বিস্মিত করে আসছে যুগ যুগ ধরে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (১৯১২-১৯৮২) ছোটগল্পেও দেখা যায় অধিকাংশ চরিত্রই প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। তাঁর গল্পে এই রহস্যময়ী প্রকৃতির বিচিত্র রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রকৃতির স্পর্শ ও সান্নিধ্য কোনো কোনো গল্পে আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দেয়। আবার কোনো কোনো গল্পে এই প্রকৃতি তার বিরাট অস্তিত্ব নিয়ে আমাদেরকে বিপন্ন, অসহায় করে তোলে। আসলে তাঁর গল্পে প্রকৃতি নিছক প্রেক্ষাপট হয়ে থাকেনি, বেশ কিছু গল্পে প্রকৃতিই চরিত্র হয়ে উঠেছে, এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিকে যেন সে-ই অঙ্গুলি সংকেতে চালনা করেছে। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা তাঁর নির্বাচিত কিছু গল্প অবলম্বনে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের অভিষ্ট।

সূচক শব্দ : প্রকৃতি, আশ্রয়, বিপন্নতা, অন্তর্বাস্তবতা, অবচেতন মন, মনোবিকলন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনায় তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার লেখক। বহির্জগতের তুলনায় মানুষের অন্তর্জগত তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছিল। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলির রহস্য উন্মোচনে তিনি নিমগ্ন থেকেছেন বরাবর। তাঁর গল্পে বাহ্যিক ঘটনা পরম্পরা বেশি গুরুত্ব পায়নি, তার থেকে মানুষের চরিত্রের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্লটকে চালিত করেছে। ষাটের দশকে বিভিন্ন গল্প আন্দোলনগুলিকে কেন্দ্র করে যে অন্তর্বাস্তবতার জোয়ার এসেছিল, তার অনেক আগেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই কাজ শুরু করেছিলেন। উল্লেখ্য, বিমল কর 'ছোটগল্প : নূতন রীতি' গল্পমালার প্রথম গল্প হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন' গল্পটিকে।

১৯১২ সালের ২০ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের কিছুদিন পরেই তিনি চলে আসেন তাঁর বাবার কর্মস্থল ব্রাহ্মণবেড়িয়ায়। এখানকার মাইনর স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত। ১৯৩৫ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন। এরপরে তিনি কলকাতায় কাজের সন্ধানে আসেন ১৯৩৭-৩৮ সালে। তাঁকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কথাশিল্পী বলা হলেও, তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত অনেক আগে। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশ থেকে আমরা জানতে পারি, "প্রথম যৌবনে তাঁর যাবতীয় সামাজিক সংযোগ সম্ভবত তাঁকে রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয় এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তপ্ত হওয়ায় উত্তপ্ত এই যুবকটিকে পুলিশী নির্য্যাতন সহ্য করে ছ'মাস কুমিল্লা জেলে বন্দী থাকতে হয়। অতঃপর আরো এক বছর স্বগৃহে তাঁকে অন্তরীণ থাকতে হল এবং এই সময় তিনি স্নাতক হলেন। জীবনের ওই রাজনৈতিক পর্বে তাঁর অন্তর্গত

রক্তের ভিতরে বাসা বেঁধেছিল ভাবী লেখক জীবনের গূঢ় গোপন স্বপ্ন। গোপনে সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে লেখার চর্চা শুরু করলেন 'জ্যোৎস্না রায়" ছদ্মনামের আড়ালে।"[১] বাংলা কথাসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আবির্ভাব সঞ্জয় ভট্টাচার্যের হাতে-লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত 'অন্তরালে' গল্পটির মাধ্যমে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন ১৯৩০ সালে কুমিল্লার যুব সম্মেলনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি উপলক্ষ্যে। এই ১৯৩০ থেকে আমৃত্যু (১৯৮২) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখে গিয়েছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় — তিপ্পান্নটি উপন্যাস এবং প্রায় দু'শোটির মতো ছোটগল্প। ১৯৩৬ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'নদী ও নারী' গল্পটি প্রকাশের পর থেকে তিনি বৃহত্তর পাঠকসমাজে পরিচিত লাভ করেন। এই বছরই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'রাইচরণের বাবরি' গল্পটি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রতিটি গল্পের ক্ষেত্রেই বিষয়গত অভিনবত্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের অবচেতন মনের নানা দিককে তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন গল্পে। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে বলা হয়েছে, "নির্জনতা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বরাবরই প্রিয় ছিল, আবাল্য নিঃসঙ্গ এই শিল্পী অন্তর্মগ্নতায় আবিষ্ট হয়ে দিনরাত্রি চুপ করে বসে-বসে ভাবতে ভালোবাসতেন।"[২] নির্জনতাপ্রিয় এই লেখকের প্রকৃতির প্রতি টান ছিল খুব ছোটবেলা থেকেই, "নিতান্ত শৈশব থেকে কৈশোরের স্বপ্নরঙিন দিনগুলোর গণ্ডী না পেরোনো পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্র প্রকৃতির রূপ-রস-সুধা আকণ্ঠ পান করতেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। নিতান্ত শৈশবে ধনু নামক যে-শিশুটি মেঘলা আকাশের মতো মুখ ভার করে ঘুরে বেড়াত, যাকে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দৃশ্য বা তিতাসের জলে নৌকো-বাইচের সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আকর্ষণ করত না অথচ যে আকর্ষণ বোধ করত খেজুর আর ডালপালা-ছড়ানো একটা শ্যাওড়া গাছের পিছন থেকে লাল টকটকে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে, তেমনই গভীর-গম্ভীর ধনু ওরফে জ্যোতিরিন্দ্রকে নিয়ে কারও কোনো আগ্রহ ছিল না।"[৩] তাই আমরা দেখি, তাঁর অধিকাংশ গল্পে প্রকৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। তাঁর গল্পে এই রহস্যময়ী প্রকৃতির বিচিত্র রূপ দেখা যায়। প্রকৃতির স্পর্শ ও সান্নিধ্য কোনো কোনো গল্পে আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দেয়, আশ্রয় দেয়। যেমন, 'নদী ও নারী', 'বনের রাজা', 'গাছ' ইত্যাদি গল্পগুলি। আবার কোনো কোনো গল্পে এই প্রকৃতি তার বিরাট অস্তিত্ব নিয়ে আমাদেরকে বিপন্ন, অসহায় করে তোলে। যেমন, 'সমুদ্র', 'জ্বালা' ইত্যাদি গল্প। 'গাছ' গল্পের গাছটি একটি নারী ও একটি পুরুষকে একই সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল, অন্যদিকে 'সমুদ্র' গল্পে সমুদ্র স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমুদ্রসম এক দূরত্ব তৈরি করে দেয়। আসলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে প্রকৃতি নিছক প্রেক্ষাপট হয়ে থাকেনি, বেশ কিছু গল্পে প্রকৃতিই চরিত্র হয়ে উঠেছে, এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিকে যেন সে-ই অঙ্গুলি সংকেতে চালনা করছে, "তিনি তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের মতোই প্রকৃতির বুকে বারংবার আশ্রয় পেয়ে খুশি হন। অথচ প্রকৃতি তাঁকে দিয়ে কখনও কবিতা লেখায় না, প্রায়ই তাঁর গদ্যের পোশাক তৈরি করিয়ে নেয়।"[৪] প্রকৃতির পটভূমিতে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করেছেন তিনি।

তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো গল্প 'নদী ও নারী' গল্পটি দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। এই গল্পের দুই চরিত্র সুরপতি ও নির্মলা লক্ষ্মণ মাঝিকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য পদ্মায় বেড়াতে এসেছে। একদিন তারা তাদের নৌকোর অদূরে সাদা রঙের একটি সুদৃশ্য বোটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সেই বোটের ছাদে একদিন নীল শাড়ি পরা, ববকাট চুলের একটি মেয়েকে ছাতা হাতে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরতে দেখে তারা। এই দৃশ্য দেখে মেয়েটিকে 'একেবারে ফ্যাশানের ফানুস', 'উগ্র রকমের একজন আধুনিকা' বলে মনে হয় তাদের। পদ্মার সঙ্গে মেয়েটির অচেনা রূপও

তাদের কাছে রহস্যময় হয়ে ওঠে। আবার এক রাতে মেয়েটির গান শুনে তাদের মনে হয় 'একেবারে সস্তা থিয়েটারী গলা'। পদ্মার চরে বন্দুক হাতে মেয়েটিকে শিকার করতে দেখে সুরপতির মনে হয়, "এমন লেফাফা দুরস্ত উগ্র সংস্করণটাই বুঝি অ্যাদ্দিন দেখবার বাকি ছিল"।[৫] মেয়েটির সম্পর্কে না জেনেই কেবল অনুমানের ভিত্তিতে তারা মেয়েটির প্রতি বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। অবশেষে একদিন তারা যখন নিজেদের কৌতূহল মেটাতে সেই সাদা বোটে গিয়ে হাজির হয়, তখন তারা জানতে পারে মেয়েটির বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার স্বামী ক্রেন দুর্ঘটনায় হাত-পা-চোখ হারিয়েছে এবং ডাক্তারের পরামর্শে নীলিমা নামের মেয়েটি তার এই পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে তিন বছর ধরে নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। মেয়েটির স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি তার স্বামীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গল্পের শুরুতে সুরপতি ও নির্মলা যে মেয়েটিকে দেহোপজীবী ভেবেছিল, গল্পের শেষে সেই মেয়েই নারীত্বের চিরন্তন ত্যাগ মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই গল্পে নারী এবং নদী তথা প্রকৃতি অভিন্ন সত্তা হিসেবে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতি যেমন আমাদেরকে আশ্রয় দেয়, লালন করে, ঠিক তেমনি এই গল্পে নীলিমার স্বামী নীলিমার স্বর্গীয় প্রেম ও যত্নের মধ্যেই আশ্রয় পেয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে তারা নদীর বুকে আশ্রয় নিয়েছে ঠিকই, তবে নীলিমাই যে তার স্বামীর বেঁচে থাকার রসদ, তা আমরা তার কথা থেকে সহজেই বুঝে নিতে পারি, "পদ্মায় ভেসে বেরালেই কি শরীর ভালো থাকে, না কেউ বেঁচে ওঠে? ওর অজস্র প্রাণশক্তি আমাকে ধরে রেখেছে।"[৬] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই 'নদী ও নারী' গল্পটির প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের 'মিতভাষণ' কবিতার শেষ দু'টি লাইন "তবুও নদী মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো/ এখনও নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো"।[৭] নীলিমার স্বামীও শুশ্রূষা পেয়েছে পদ্মার বুকে, নীলিমার আশ্রয়ে। নদী ও নারী সমতুল্য হয়ে উঠেছে এই গল্পে।

'বনের রাজা' গল্পেও দেখা যায় 'এক কালের বড় ইঞ্জিনিয়ার' সারদা রায় শহুরে ভোগবিলাসের জীবন ছেড়ে বৃদ্ধ বয়সে গ্রামের বিশাল প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। তিনি গাছের সঙ্গে কথা বলেন, "ডাল পাতা ফুল কুঁড়ি ফল সব—সবাই ফিসফিস করে আমার সঙ্গে কথা বলে।"[৮] শহুরে গাছের নিস্তব্ধতার কারণও তিনি যেন অনুভব করতে পারেন, "শহরের গাছেরা কথা বলে না, পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে তাদের জিভ খসে পড়েছে, গাড়ির ঘড়ঘড় আর রেডিওর চেঁচামেচি শুনে শুনে তাদের কান ভোঁতা হয়ে গেছে।"[৯] তাঁকে দেখে তাঁর দশ বছর বয়সী নাতি মতি প্রতিমুহূর্তে নিজের বাবা-মার শহুরে কৃত্রিম জীবনযাপনের ত্রুটিগুলো ধরে ফেলে। নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ তার মন থেকে ক্রমশ খসে পড়তে থাকে। দাদুর সঙ্গী হয়ে সেও গাছপালা, ফুলফলের জগতে বিচরণ করতে করতে ক্রমশ সম্মোহিত হয়ে পড়ে। তাই শেষপর্যন্ত দাদুর নির্দেশে উলঙ্গ হতে তার আটকায় না। প্রকৃতির মাঝে বৃদ্ধ সারদা যেন ছোট্ট বালক হয়ে যান, তাই নাতিকে তিনি বলেন, "আম বাগানে কি জাম বাগানে থাকলে, যখন দেখি বেশি ঘাম দিচ্ছে শরীরে, গরম কমছে না, গায়ে কিছু থাকলে খুলে ফেলে লেংটা হয়ে ঘাসের ওপর হাত ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি।"[১০] এই গল্পের সারদারই মতো 'নীল পেয়ালা' গল্পেও আমরা দেখি, প্রকৃতির কোলে মানুষ যেন শিশু হয়ে ওঠে, "এই ক্যানেলের ধারে বাঁকাচোরা পত্রহীন পাকুড় গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে জলের ওপর শীতের সকালের রৌদ্রের অচঞ্চল প্রশান্ত হাসি দেখতে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি ছোট হয়ে গেছেন, কিশোর হয়ে গেছেন; শুকনো খসখসে দাড়ির গালে হাত বুলোতে বুলোতে তাঁর মনে হয়েছিল ইচ্ছা করলে মানুষ তার বয়স কমিয়ে দিতে পারে। ... মনের দিক থেকে আশ্চর্য এক তারুণ্যের উত্তাপ অনুভব করতে করতে বৈদ্যনাথ কেমন যেন অস্থির ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।"[১১] সারদা তাঁর পরনের পোশাক ঘাসের ওপর রেখে নগ্ন হয়ে ছোট্ট বালকের মতো পুকুরে নেমে যান সাঁতার কাটতে। তিনি জল থেকে উঠে এলে,

তাঁর উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে নাতি মতির মনে হয় "একটা পুরনো গাছ। অনেকদিন জলের নিচে থাকার পর এখন উঠে এসেছে। গাছের রাজা তো গাছই হবে।"[১২] মতির মনে হয় দাদুর গায়ের সাদা ধূসর লোমগুলি যেন 'গাছের গায়ের শ্যাওলা'। বাড়ি ফেরার পথে মতির কাঁধে দাদু যখন হাত রাখেন, তখন দাদুর গায়ের চামড়ার গন্ধ তার নাকে লাগে, "মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না! কোমল মিষ্টি ঠাণ্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। মতি বুঝল।"[১৩] দাদু সারদার মতো মতিও যেন পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতিকে বুঝতে শিখে যায়। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও আজীবন প্রকৃতির শব্দ ও গন্ধের মধ্যে আদ্যন্ত নিমজ্জিত ছিলেন। তাই তাঁর এই প্রকৃতিনির্ভর গল্পগুলিতে অতি মাত্রায় ইন্দ্রিয় সচেতনতার পরিচয় পাই আমরা।

'গাছ' গল্পটিতে একটি গাছের প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে চূড়ান্ত রসসিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। দু'তিনটে বাড়ির মাঝখানে একফালি পোড়ো জমিতে সবুজ একটি গাছ নিজের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, "বর্ষার পাতাগুলি বড় হয় পুষ্ঠ হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ সেই সবুজ-কালো গভীর ধূসর হয়ে ওঠে, তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নিরক্ত প্রসূতির পাণ্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে।"[১৪] পূর্ব দিকের একটি বাড়ির সবুজ জানালা দিয়ে এক যুবতী গাছটিকে লক্ষ করে, একসময়ে তার মনে হয় যে গাছটি শয়তান, গাছটিকে কেটে ফেলা দরকার, গাছটিকে সে ঘৃণা করতে শুরু করে। কিন্তু পশ্চিমদিকের বাড়ির লাল রঙের জানালার মানুষটির সহানুভূতি সবাইকে বুঝিয়ে দেয়, "ইট, লোহা, সিমেন্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। আমরা যে এখনো পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাইনি মিথ্যা হয়ে যাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটা কবিতার মতো।"[১৫] এই পুরুষটিই যেন লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রতিকৃতি হয়ে ওঠে গল্পে। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশ থেকে আমরা জানতে পারি "কলকাতার সুবিশাল অট্টালিকাসমূহ তাঁর চোখে কোনো সম্ভ্রম জাগায় না অথচ একটা ছোট্ট চারা কীভাবে বিশাল বৃক্ষ হয়ে ওঠে তা তাঁর ভাবনা-চেতনাকে দিনরাত্রি দখল করে থাকে।"[১৬] মেয়েটি যখন গাছটিকে কেটে ফেলতে উদ্যত হল, তখন দেখা গেল প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সেই ক্ষমাসুন্দর পুরুষটি, যে মেয়েটিকে প্রেমের দীক্ষা দিল, "ভালবাসতে শিখতে হবে।"[১৭] তখন "গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারেনি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।"[১৮] এই 'অভিজ্ঞ গাছ' নিছক গাছ হয়েই থাকে না, তার উদাসীনতার মধ্য দিয়ে তার ওপর আরোপিত হয় মানবত্ব, এভাবেই সে হয়ে ওঠে যথার্থ এক চরিত্র।

'গাছ' গল্পটির মতোই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চোর' গল্পটিও আবর্তিত হয়েছে একটি ছোট্ট চারাগাছকে কেন্দ্র করে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর মিন্টু এই গল্পের কথক। বড়লোক সহপাঠী সুকুমারদের থেকে নিজেদের পার্থক্য তার কাছে খুব স্পষ্ট—"ব্যারিস্টারের ছেলে। ভালো জামা জুতো পড়ে স্কুলে আসে। আমার সহপাঠী। কিন্তু তা হলে হবে কি সুকুমার আমার সঙ্গে ভালো করে মিশবে দূরে থাক, কথাই বলে না। আমার সঙ্গে না, হাবুলের সঙ্গে না, সনাতনের সঙ্গে না। ওর বন্ধু অংশু, অনুপম, নীহার; ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। আমরা খালি পায়ে স্কুলে আসি, আমাদের জামা প্যান্ট ময়লা-ছেঁড়া।"[১৯] এই সুকুমারদের বাড়ির কাজের ছেলে হল মদন। সেও সুকুমার,

মিন্টুদেরই সমবয়সী এক কিশোর। অসুখে দেশে গিয়ে ফিরে আসার পর তার চাকরি চলে যায় সুকুমারদের বাড়িতে। তখন সে আসে মিন্টুদের বাড়িতে। দশ টাকার জায়গায় তিন টাকা অর্থাৎ অনেকটা কম মাইনেতেই সে এই বাড়িতে কাজ পায়। তবে সে এই বাড়িতে পুত্রস্নেহ লাভ করে, মিন্টুর মা বলে "মিন্টু আমার ছেলে, তুইও আমার ছেলে"।[২০] মিন্টু ও মদন বন্ধু হয়ে ওঠে। তারা একসঙ্গে বাগান করে। মদন চায় আরও নতুন নতুন গাছের চারা এনে লাগাতে। সে চুরি করে আনবে সেই সব চারা, লক্ষ্য অবশ্যই সুকুমারদের বাগান, কারণ কাজ ছাড়িয়ে দেওয়ায় সুকুমারদের বাড়ির উপর মদনের খুব রাগ, "সুকুমারদের বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে বাগানের সব ফল আর মূলের চারা নিয়ে আসব। যেগুলো আনতে পারা যাবে না, ভেঙে মুচড়ে নষ্ট করে রেখে আসব।"[২১] কিন্তু পরে যখন সে সুকুমারদের বাড়িতে পুনরায় আশ্রয় পায়, তার কদিন পরে দেখা যায় মিন্টুদের বাগান থেকে পেঁপে চারাটিকে কেউ যেন উপড়ে নিয়ে গিয়েছে। সবাই ভাবে বৃষ্টিতে সেটি ভেসে গিয়েছে, কিন্তু ক'মাস পরে সুকুমারদের বাড়িতে গিয়ে ওদের বাগানে সেই পেঁপে চারাটিকে আবিষ্কার করে মিন্টু। তারপর থেকে মিন্টু মাঝে মাঝেই সুকুমারদের বাড়িতে যায় এবং সেই পেঁপে চারাটিকে দেখে। একদিন হঠাৎ তার উপলব্ধি হয় যে, সে কেবল পেঁপে গাছটির জন্যই সুকুমারদের বাড়িতে আসে, তা নয়। বাড়ি ফিরে সে কাঁদে কিন্তু সে মাকে তার কারণ বলতে পারে না, "আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা কাপড় পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে গিয়ে ও-বাড়ির শাড়িগয়না-পরা প্রগলভ-স্বাস্থ্য সুকুমারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কখন তিনি সাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও সুকুমারকে আপেল, আনারস কেটে দেবেন সেই সোনা-ঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি শুকিয়ে থাকতাম—থাকতে আরম্ভ করেছি।"[২২] এই নির্মম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কৈশোর টপকে হঠাৎ যেন বড় হয়ে যায় মিন্টু। সে আর সুকুমারদের বাড়িতেও কখনো যায় না। এই গল্পে আপাতভাবে পেঁপেগাছটি চুরি গেলেও, আসলে চুরি যাচ্ছিল মদন, মিন্টুদের কৈশোর, "মদন পেঁপে চারাটা চুরি করে নিয়ে যায়নি। আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপে চারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কেবল মদনকে না, আমাকেও, না হলে আমাদের ছোট উঠোন, টিনের ঘর, ছায়া-ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকবো কেন।"[২৩] সুকুমারদের বৈভব চুরি করে নিচ্ছিল তার কিশোর মনকে। প্রত্যক্ষভাবে এই গল্পের চোর মদন কিন্তু পরোক্ষে গল্পের চোর আসলে বিত্তশালী সমাজ। সুকুমারদের অনন্ত ঐশ্বর্য মদনের পাশাপাশি মিন্টুকেও তো চুরি করে নিচ্ছিল তার দরিদ্র পিতা-মাতার সংসার থেকে। সেই সংকোচে, সেই লজ্জায়, ভয়ে, অপরাধবোধে মিন্টু কেঁদে ফেলে। আত্মসচেতন মিন্টু নিজেকে সস্থানে ফিরিয়ে আনতে পেরে স্বস্তি পায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মনস্তত্ত্বমূলক গল্প রচনা করতে গিয়ে কিশোর চরিত্র নিয়ে নানাভাবে ভেবেছেন এবং 'চোর' গল্পটি এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প।

'সামনে চামেলি' গল্পে দেখি নানা রকম ফুলের গন্ধ ও বিভিন্ন শব্দ ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে উদাস, উন্মনা করে তোলে। জীবনের যাবতীয় অচরিতার্থতার টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো তাকে বেদনা-বিধুর করে তুললেও রাধাচূড়া, ইউক্যালিপটাস, দেবদারু বেষ্টিত ব্যালকনিতে এক যুবতীকে দেখে সে ক্ষণিকের জন্য স্বপ্নাবিষ্ট হয়। স্বপ্নভঙ্গের পরে সেই বিপন্ন যুবকটি পুনশ্চ অনুভব করে সামনে কোথাও চামেলি ফুটেছে কিনা তার সন্ধানে নিরন্তর এগিয়ে চলা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। বাইরে নিঃস্ব হয়েও সে হৃদয়-ধনে ধনী, কারণ সে সৌন্দর্য্যের পূজারী, প্রকৃতি-প্রেমিক; তার আছে 'সুন্দরের পিপাসা, রূপের তৃষ্ণা, পরিচ্ছন্নতার মোহ'।[২৪] তার মতোই গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও শত দুঃখের মধ্যেও মানবমনের অভ্যন্তরস্থ এই সৌন্দর্য্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাঁর 'সমুদ্র' গল্পে প্রকৃতির অন্য আরেকটি রূপের মুখোমুখি হই আমরা, সেই রূপ 'উত্তাল অশান্ত ক্ষিপ্ত প্রখর'। সমুদ্রের পটভূমিকায় তিনটি চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে জাল বুনেছেন গল্পকার। স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে এসে গল্পকথকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে 'মামা' নামে পরিচিত এক অদ্ভুত চরিত্রের। সমুদ্রকে নিয়েই আলাপ এগিয়েছে তাদের মধ্যে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'The Old Man and the Sea' উপন্যাসের বৃদ্ধ মৎসজীবী সান্তিয়াগোর মতো এই গল্পের মামা চরিত্রটি নিজের সমগ্র সত্তা জুড়ে আত্মস্থ করে নিয়েছে সমুদ্রকে, তার সেই স্বীকারোক্তিই তার প্রমাণ, "আমি চব্বিশ ঘন্টার ছুটি নিয়ে এসেছিলাম সমুদ্র দেখতে চব্বিশ ঘন্টা আজ কুড়ি বছর হতে চলল।"[২৫] সে কথককে আরও বলেছিল, "আপনার রক্তের মধ্যে ওই শব্দ চলে যাবে মগজের ভিতর ছবিটা আটকা পড়বে আজ না, ক'দিন তাকিয়ে থাকুন তখন আর কোনো কাজকর্ম ভাল লাগবে না, চোখের ঘুম উধাও হবে, ক্ষুধা কমে যাবে।"[২৬] সমুদ্রকে সে পাগলের মতো ভালবেসেছে বলেই তার চোখে সমুদ্রের নানা রূপ ধরা পড়ে, তাই সে এই প্রশ্নটি করতে পারে, "দূরের সমুদ্র সুন্দর কি কাছের কোনটা আপনার ভালো লাগে?"[২৭] কিংবা হেনাকে সমুদ্রের জলে খেলা করতে দেখে সে রেগে যায়, কারণ তার বক্তব্য হল, "ফুলের ওপর যদি একটা মাছি বসে থাকে আপনার ভালো লাগবে?"[২৮] মামার মতে সমুদ্রের এক জীবন্ত সত্তা আছে, তার সঙ্গে ইয়ার্কি তামাশা চলে না। তাই ক্ষুধার্ত সমুদ্রকে খাওয়াতে ভালোবাসে সে, তবে ফুল বেলপাতা নয়, "ফুল বেলপাতা, আপনি চিবিয়ে খান, না আমি খাই?"[২৯] তার কাছে সমুদ্র "পাথরের দেবতা না, মাটির ঠাকুর না সমুদ্র হল সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ।"[৩০] তাই মামা যখন সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে আসে, পকেটে করে নিয়ে আসে 'মাছভাজা, সিঙ্গাড়া, রুটি, কেক, ডিমের বড়া' ইত্যাদি। এমনকী একটি এলসেশিয়ান কুকুরছানা এবং নিজের স্ত্রীকেও সে সমুদ্রে বিসর্জন দিয়েছিল। অন্যদিকে, সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে-বেড়িয়ে, জলে পা ভিজিয়ে, ঝিনুক কুড়িয়ে, সমুদ্রের মাছ দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে সমুদ্র-ভ্রমণের স্বাদ মিলেছিল হেনার। তাই তাকে অসহ্য লাগতে থাকে কথকের, "তুমি ছোট—অনেক ছোট; সমুদ্রকে তুমি বোঝ না, চেন না।"[৩১] কিংবা, সে ভাবে, "বিরাটের কাছে এসে তোমার কি লাভ হল মেয়ে।"[৩২] একদিকে বিপুল সমুদ্রের সান্নিধ্যে এসে জীবনের ব্যাপ্তি অনুভব, অন্যদিকে সুস্থ স্বাভাবিক গণ্ডীবদ্ধ সাংসারিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটে কথকের মনে। কথকের সমগ্র চেতনা জুড়ে সমুদ্র তার রহস্যময় ভয়ংকর বিশাল অস্তিত্ব নিয়ে হাজির হয়ে কথকের সমগ্র অতীতকে তুচ্ছ করে দিয়েছে, তার স্ত্রী হেনাকে যেন ক্রমশ মুছে দিয়েছে। উপরন্তু সমুদ্র-পাগল মামার দুর্নিবার প্ররোচনা কথকের চোখের সামনে সমুদ্রকে এক ভয়ঙ্কর লুব্ধ দানবের প্রতিকৃতি হিসেবে গড়ে তুলেছিল, তাই কথক তার স্ত্রী হেনাকে উন্মত্ত উত্তাল সমুদ্রের কাছে উপহার দিতে উদ্যত হয়। এভাবে মনোবিকলনের শিকারে পরিণত হয় গল্পকথক। সমুদ্র কেবল কথকের চেতনার বিস্তার ঘটায় না, চেতনাকে গ্রাসও করে। সমুদ্র এখানে নিছক প্রাকৃতিক কোনো জড়বস্তু নয়, একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে, এবং সে-ই যেন গল্পের কেন্দ্র-শক্তি হয়ে অন্যান্য চরিত্রগুলিকে পরিচালনা করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পটিতে আমরা দেখেছিলাম, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নীলার শৈশব থেকেই সমুদ্র দেখার সাধ ছিল। কিন্তু সেই সাধ পূরণ হয়নি। সমুদ্রের স্বাদ সে পেয়েছিল চোখের নোনা জলে। আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সমুদ্র' গল্পে কথক বা মামা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর এক ভিন্নধর্মী স্বাদের আস্বাদন লাভ করি আমরা। জীবনে প্রথমবার সমুদ্র দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই গল্পটি লিখেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "জীবনে প্রথমবার সমুদ্র দেখার পর লেখা হল ঐ 'সমুদ্র' গল্প। সমুদ্রকে আমি ভুলতে পারিনি, আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বহুদিন।"[৩৩]

'জ্বালা' গল্পে মানুষের মনের অন্তস্থ জ্বালার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে প্রকৃতি। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুঃসহ গরম হাওয়ায় উত্তপ্ত দীর্ঘ দুপুর যেন আর কাটে না নীরার। জ্যৈষ্ঠের রোদ যেন আগুনের শিখা হয়ে শিস দিয়ে বেড়ায় রাস্তায়। এই রোদ যেন মানুষের মনে জ্বালা আরও বাড়িয়ে তোলে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিলের ডাক। এর পরেই আমরা দেখি নীরাকে জ্বালাতে আসে এক ভয়ঙ্কর কুৎসিত পুরুষ, ছুরি-বটি-কাঁচি শানওয়ালা। নীরার ছোট্ট মেয়ে পিন্টুরানী, সেই শানওয়ালাকে ভয় করে না, তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের গল্প শোনে। কিন্তু নীরার চোখে লোকটা যেন একটা পিশাচ, পাপী, নিষ্ঠুর, শয়তান। তার চোখের দৃষ্টির জ্বালায় সারা অঙ্গ যেন জ্বলে যায় নীরার। শানওয়ালার চেহারা, তার বিকট ধারালো যন্ত্রপাতি দেখে পিন্টুরানীর জীবন সম্পর্কে নীরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং জানা যায় যে, শানওয়ালা তার সুন্দরী বউকে হত্যা করেছিল অভাবের তাড়নায়। এই গল্পের মতো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অধিকাংশ গল্পে ঘটনার ঘনঘটা নেই। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির বিকাশ ঘটে অত্যন্ত ধীর লয়ে। গল্প যত এগোয়, পাঠক ততই এক গভীর রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করে। এই গল্পগুলো একইসঙ্গে প্রকৃতি বিষয়ক আবার মনস্তাত্ত্বিক।

আবার 'বৃষ্টির পরে' গল্পে আমরা প্রকৃতির দ্বিবিধ রূপেরই ছবি পাই। এই গল্পের কথকের বয়ানে, "আমার ফুল আমার বাগানের রজনীগন্ধা। দুদিন পর এসো। তখন ঈর্ষা করবে। ঘন বর্ষা শুরু হবে, আর সতেজ উদ্ধত লাবণ্য নিয়ে সবুজ ডাঁটারা রানীর মতো হেলে দুলে তোমায় জানিয়ে দেবে, এ-বাগানের মালিক কে, কে এই সৌভাগ্যবান পুরুষ। ... কিন্তু কদিন প্রভাত, কদিন ওরা আমার থাকবে? কৃষ্ণচূড়ারা কদিন আমার বাড়ির সামনেটা আলো করে ছিল? যেদিন বর্ষণ থামবে, একবার এসে উঁকি দিও। তোমার কান্না পাবে বাগানের চেহারা দেখে। হয়তো সেদিন আমাকে মনে মনে অনুকম্পা করবে। কিন্তু সত্যি কি আমি কাঁদব প্রভাত, যা রইল না মরে গেল তার জন্য? না, সেদিন নতুন করে আমাকে দেখতে ভালবাসতে আর একজন আসছে। হিমের স্পর্শ পেয়ে শিউলিরা চোখ খুলছে।"[৩৪]

'শ্বাপদ' গল্পে আমরা দেখি সেই বন্য শ্বাপদ-প্রতিম ছেলেটি তার গ্রাম্য সরল মন ও স্বাস্থ্য-শক্তি-সাহস দিয়েই ছিনিয়ে নেয় শহুরে ছেলেটির তরুণী বান্ধবীকে। শহুরে মাসতুতো ভাইয়ের কাছেই সে যৌনতায় দীক্ষিত হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে আমরা দেখি বাগানের গাছপালার মধ্যেই সে রুবিকে নিয়ে হারিয়ে যায়, "সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সে অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।"[৩৫] যৌনতার প্রসঙ্গ এই গল্পে বারবার ঘুরে ফিরে এলেও তা কখনই রুচির সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায়নি। বরং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী রক্তমাংসের মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে প্রকৃতির এক বৃহত্তর পটভূমিকায় খেলা করেছেন শৈল্পিক সুষমায়। মানুষের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা, যৌনতা, স্বপ্ন-হতাশা, তৃপ্তি-অতৃপ্তি ভরা মানব মনের বেশিরভাগটাই অধরা থেকে যায় আমাদের কাছে। সেই অবচেতনের জটিল অরণ্যে অনায়াস দক্ষতায় যাতায়াত করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আরও অনেক গল্পে।

আবার তাঁর 'পার্বতীপুরের বিকেল' গল্পটি একটি রাজনৈতিক গল্প হয়ে উঠতে পারতো। কারণ 'যারা গরিব চাষী মজুরকে ঠকিয়ে খায়, মাঠের ফসল তুলে নিয়ে কালোবাজারে চালান দেয়, চালে পাথর মেশাচ্ছে, তেলে আটায় ভেজাল দিচ্ছে', তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে এই গল্পের আনন্দ নিহত হয়েছিল। অথচ এই রাজনীতির প্রসঙ্গ তেমনভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি এই গল্পে। কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ নয়, দেশপ্রেমের কথাই এখানে মৃত আনন্দ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু সেটিও কাহিনীর 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' বর্ণনায়। কাহিনীতে প্রধান হয়ে উঠেছে সেই মৃত পুত্রের জন্য শোকাতুর বৃদ্ধ পিতা কীভাবে নির্জন গাছপালা ঢাকা গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ধরুন আমার "পার্বতীপুরের বিকেল"

গল্প। এরকম মাঝে মাঝে এসে গেছে, তবে আমার গল্পের মূলধারায় এসব কোনো দিন আসেনি। আসেনি এজন্যে যে সেটা একটা বিরাট ব্যাপার। দেশ স্বাধীন হয়েছে, অনেকে রক্ত দিয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন, শহীদ হয়েছেন। আমি আমার রচনায় তাঁদের সাধারণ মানুষ হিসেবে যে মানসিকতা তাকে ধরার চেষ্টা করেছি, নেতা বা শহিদ হিসেবে নয়।"[৩৬]

প্রকৃতি-নির্ভর গল্পগুলি রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এভাবেই বিষয়গত বৈচিত্রে ও অভিনবত্বে অন্যান্যদের থেকে পুরোপুরি পৃথক হয়ে যান। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে বলা হয়েছে, "জ্যোতিরিন্দ্র সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় আবৃত্তি করে একখণ্ড "গল্পগুচ্ছ' উপহার পেয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়ে তিনি আবিষ্ট হয়ে যান, ক্রমশ প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র তাঁর প্রিয় লেখকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন। কিন্তু ভাবলেও অবাক হতে হয়, তাঁর এই প্রিয়তম লেখকগোষ্ঠী তাঁর রসাস্বাদ মিটিয়েছেন, চিত্তকে নন্দিত করেছেন কিন্তু শিল্পভাবনাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের বিষাদ ব্যাকুল বৈরাগ্য, প্রভাতকুমারের তরল মধুর হাস্যরস এবং শরৎচন্দ্রের বাঙালিসুলভ ভাবালুতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাঁর রচনা। তাঁর গল্পে বিষাদ আছে কিন্তু বৈরাগ্য নেই, হাস্যরস পরিবেশনায় তাঁর কোনো আগ্রহ নেই এবং ভাবালুতার তিনি ঘোরতম শত্রু।"[৩৭]

ভাষাগত দিক থেকেও তাঁর স্বাতন্ত্র খুব সহজেই চোখে পড়ে। তিনি প্রকৃতিকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর অধিকাংশ গল্পে প্রকৃতি নিছক প্রেক্ষাপট হিসেবে থাকেনি, হয়ে উঠেছে জীবন্ত চরিত্র। প্রকৃতির ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়েছে অধিকাংশ গল্পে। আর ভাষাতেও প্রকৃতির সেই রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের বর্ণনা। তাই মাঝে মাঝেই ভাষা হয়ে উঠেছে কাব্যানুসারী। এমনকী তিনি যাবতীয় উপমা, তুলনাগুলো যেন খুঁজে পান প্রকৃতির আনাচে কানাচে থেকেই—

১. 'বৈদ্যনাথের বয়সের আর পাঁচটা পাকা খসখসে দাড়ির গাল, পাকা খেজুরের মতো শুকনো গায়ের চামড়া, মরা মাছের চোখের ফ্যাকাসে রং।"[৩৮] (নীল পেয়ালা)

২. "আমরা যে সমুদ্রের কত কাছে রয়েছি, কথাটা ভুলে গিয়ে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানার গর্তে নিশ্চিন্ত আরামে একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে ঘৃণা হচ্ছিল।"[৩৯] (সমুদ্র)

৩. "সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া হেনাকে আবছা অন্ধকারে একটা খরগোশের মতো দেখাচ্ছিল।"[৪০] (সমুদ্র)

৪. "আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি কোনফুলের সঙ্গে কোনফলের সঙ্গে এই থুতনির তুলনা চলে। মচকা ফুল না না না, করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে, অবিকল সে রকম।"[৪১] (গিরগিটি)

৫. "যা-ও একটু হাসির রোদ লেগে ঘোলাটে চোখ দুটো চিকচিক করছিল এখন আবার মরা মাছের চোখের মতন ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন শুকনো হাঁটুর সঙ্গে দুটো হাত ঠেকানো।"[৪২] (গিরগিটি)

৬. "দু'বছর আগে কুমারী বয়সে যেমন ছিল আজও সেই থুতনি নিটোল অক্ষত হয়ে নিজের জায়গায় চুপ ক'রে বসে আছে। যেন এর ক্ষয় নেই বৃদ্ধি নেই জরা নেই। কচি পেয়ারা।"[৪৩] (গিরগিটি)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মানুষের তুলনা যেমন প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি প্রকৃতির তুলনা খুঁজে পেয়েছেন মানুষের মধ্যে। 'গিরগিটি' গল্পে আমরা দেখি ডালিম গাছটির বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, "লম্বা ঋজু একটি মেয়ের সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে

তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেকগুলো আঙুল ! আঙুল ছেয়ে নতুন লালচে সবুজ পাতার ঝিলিমিলি। হাওয়ায় দুলছে নড়ছে। যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলোমেলো চুলে বিলি কাটছে আর খিলখিল হাসছে।"[৪৪] আবার 'পার্বতীপুরের বিকেল' গল্পে গাছকে তুলনা করা হয়েছে মানুষের সঙ্গে, "মাঠের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চার-পাঁচটা বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, চোখে পড়ল। যেমন সবুজ নিচের ঘাসের রঙ তেমন আবার মিশমিশে কালো বাবলা গাছের কাণ্ডগুলি। যেন মনে হচ্ছিল চার-পাঁচটা কালো রঙের মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মাঠটাকে পাহারা দিচ্ছে।"[৪৫]

আদ্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর চোখে প্রকৃতির খুব খুঁটিনাটি ঘটনাও নজর এড়িয়ে যায়নি। তাই তাঁর এই প্রকৃতি-নির্ভর গল্পগুলিতে 'ডিটেলিং'-এর প্রয়োগ আমাদেরকে অভিভূত করে—

১. "আরো দুটো শুকনো লালচে বাদাম পাতা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে ঘুরতে ঘুরতে ঘাসের বুকে নেমে এল। আগুন রঙের ফড়িংগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দুটো কালো রঙের ফড়িং কোথা থেকে এসে জুটল। সবাই একসঙ্গে পাক খেয়ে ওড়াওড়ি করছে।"[৪৬] (চন্দ্রমল্লিকা)

২. "মায়া সবুজ চকচকে চিকরিকাটা নিমপাতাগুলোর নাচানাচি দেখতে লাগল। আকাশের থমথমে মেঘলা ভাব কেটে গিয়ে একটু সময়ের জন্যে রোদ উঠতে পাতাগুলো যেন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে একটাল ইট কবে থেকে পড়ে আছে। মখমলের মতন পুরু নরম সবুজ শ্যাওলার একটা আস্তরণ সবগুলো ইটকে যেন জমিয়ে এক করে দিয়েছে। আগুন রঙের দুটো ফড়িং সবুজ ইটের পাঁজা ঘিরে নাচানাচি করছে। ওপাশের ডুমুরের ডালে এত বড় একটা গিরগিটি স্থিরচোখে তাকিয়ে ফড়িং দুটোকে দেখছে। যেন কোথাও একবার একটু শান্ত হয়ে ওরা বসলে সে লাফিয়ে পড়ে ওদের ঘাড় কামড়ে ধরবে। করুণ চোখে ফড়িং দুটোকে আর একবার দেখে মায়া আস্তে আস্তে কুয়োতলার দিকে চলল।"[৪৭] (গিরগিটি)

এই দেখা তো নিছক মায়ার নয়, লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মায়ার চোখে প্রকৃতিকে এভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত মানবমনের জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনাই আলোচ্য গল্পগুলির উপজীব্য। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে বলা হয়েছে, "গোত্রে ও ধর্মে তিনি চিরকাল নিঃসঙ্গ, স্বপ্নে ও সাধনায় মূলত তিনি আদিম প্রকৃতির পটভূমিতে আদিম মানুষের হৃদয় রহস্যের অনুসন্ধানে মগ্ন।"[৪৮] প্রকৃতি ও মানবমনের গহন অরণ্যে বিচরণ করার জন্য গল্প-খোর সাধারণ পাঠকের দাবি-দাওয়ার ধার ধরেননি তিনি। তাই ঘটনার ঘনঘটা তাঁর গল্পে তেমন নেই বললেই চলে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "আমি লিখেছি আমার মতো করে, সবসময়েই আমি মনে করি যে যে-জিনিসটা আমি লিখতে যাচ্ছি তা যদি আমি ঠিক-ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারি তবে কোনো-না-কোনো পাঠকের মনে নাড়া দেবেই এ-লেখা। কোনো পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করব বলে আমি কোনো লেখা লিখি না। আমার লেখার দিকেই তখন মনটা থাকে, এবং আমি জানি যে একটা ফুলের মতো, সেটা যদি ভালো করে ফোটে, তার যদি গন্ধ থাকে,তার যদি মধু থাকে, তবে পতঙ্গ আসবেই। সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারে এই যে একটা চেতনা, এই যে বোধ, এই নিয়েই আমি কাজ করি।"[৪৯] শৈশব থেকেই প্রকৃতির প্রতি তাঁর টান, প্রকৃতি-নিমগ্নতা তাঁর লেখনীকে এক অন্য জগতের হদিশ দিয়েছে। প্রকৃতি-নির্ভর গল্প রচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ মর্য্যাদার আসন দাবি করেন, "কেননা চলতে চলতে দেখা, আর দেখবার জন্য থমকে দাঁড়ান এক কথা নয়।"[৫০]

তথ্যসূত্র

১. নিতাই বসু (সম্পাদিত), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১০।

২. তদেব, পৃ. ৭।

৩. ঐ।

৪. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ৮।

৫. তদেব, পৃ. ৩১।

৬. তদেব, পৃ. ৩৩।

৭. জীবনানন্দ দাশ, বনলতা সেন, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪, পৃ. ৪১।

৮. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ৭১।

৯. তদেব, পৃ. ৭২।

১০. তদেব, পৃ. ৭৯।

১১. তদেব, পৃ. ১৯৮।

১২. তদেব, পৃ. ৮৬।

১৩. ঐ।

১৪. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ২৬৭।

১৫. তদেব, পৃ. ২৭০।

১৬. তদেব, পৃ. ৮।

১৭. তদেব, পৃ. ২৭২।

১৮. ঐ।

১৯. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ১৯১।

২০. তদেব, পৃ. ১৯০।

২১. তদেব, পৃ. ১৯১।

২২. তদেব, পৃ. ১৯৭।

২৩. ঐ।

২৪. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ২৬২।

২৫. তদেব, পৃ. ৪৯।

২৬. তদেব, পৃ. ৪৮।

২৭. তদেব, পৃ. ৪৬।

২৮. তদেব, পৃ. ৪৯।

২৯. তদেব, পৃ. ৫৪।

৩০. ঐ।

৩১. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ৪১।

OPEN EYES

৩২. তদেব, পৃ. ৪৩।

৩৩. 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে একটি সন্ধ্যা', সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত, অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পাদিত), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা চতুর্থ, কলকাতা ০৯, শারদীয় ১৪১৬, পৃ. ২৬৫।

৩৪. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ৬৯।

৩৫. তদেব, পৃ. ১৬০।

৩৬. লোথার লুৎসে ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), পাঠকের মুখোমুখি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃ. ১২৭।

৩৭. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ৯।

৩৮. তদেব, পৃ. ১৯৯।

৩৯. তদেব, পৃ. ৪০।

৪০. তদেব, পৃ. ৪১।

৪১. তদেব, পৃ. ১১৮

৪২. ঐ।

৪৩. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ১০৮।

৪৪. তদেব, পৃ. ১১৫।

৪৫. তদেব, পৃ. ২১৩।

৪৬. তদেব, পৃ. ২০৭।

৪৭. তদেব, পৃ. ১১০।

৪৮. তদেব, পৃ. ১২।

৪৯. লোথার লুৎসে ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'পাঠকের মুখোমুখি', পৃ. ১২৩।

৫০. নিতাই বসু (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', পৃ. ২৫৬।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অমরচন্দ্র কর্মকার (সম্পাদিত), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী: গল্পের অন্দরমহল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, কলকাতা বইমেলা ২০১৭।

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, সংস্করণ অক্টোবর ২০১৬।

৩. জীবনানন্দ দাশ, বনলতা সেন, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪।

৪. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, গল্পসমগ্র-১, আনন্দ, কলকাতা-০৯, জানুয়ারি ২০১৫।

৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, অষ্টম মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২৫।

৬. নিতাই বসু (সম্পাদিত), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৫।

৭. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪।

৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমুদ্রের স্বাদ, দি বুকম্যান, কলকাতা-১৩, ফাল্গুন ১৩৫২।
৯. রঞ্জনা দত্ত, স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, বৈশাখ ১৪১৭।
১০. লোথার লুৎসে ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), পাঠকের মুখোমুখি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, কলকাতা বইমেলা ২০১৪।
১১. শ্রাবণী পাল (সম্পাদিত), বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৮, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।
১২. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৬।
১৩. Ernest Hemingwa, The Old Man and the Sea, Charles Scribnerós Sons, New York, ১৯৫২।

পত্রিকাপঞ্জি

১. অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পাদিত), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা চতুর্থ, কলকাতা ০৯, শারদীয় ১৪১৬।
২. উজাগর, উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), উজাগর প্রকাশন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, ১৪১৭।
৩. শুভশ্রী, শান্তনু সরকার (সম্পাদিত), 'ছোটগল্পকার : স্মরণে-বিস্মরণে' সংখ্যা, ৫০ বর্ষ, ১৪১৮।

শিউলি বসাক
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার পাঠকের দর্পণে

পাপ্পুসোনা গান্ধী

জনপ্রিয় সাহিত্য মাত্রেই উচ্চমানের সাহিত্য কি না এ নিয়ে সমালোচকমহলে বিতর্কের শেষ নেই। সে বিতর্কে না গিয়েও এ কথা বেশ জোরের সাথেই বলা যেতে পারে যে, এ কালের অন্যতম প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সাহিত্য একই সাথে জনপ্রিয় এবং যথেষ্ট উচ্চমানের। তাঁর লেখা 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ', 'মৌষলকাল', 'আট কুঠুরি নয় দরজা' ইত্যাদি বহু উপন্যাস যেমন পাঠক ও সমালোচক মহলে সাড়া ফেলেছে তেমনই তাঁর বহু লেখার চলচ্চিত্রায়ণও হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৭ সালে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি একের পর এক নানান স্বাদের গল্প-উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্ত মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও সংকট, প্রেম, যৌনতা কি নেই তাঁর কথাসাহিত্যের ভুবনে। দেশ ও কালের, জীবন ও জিজ্ঞাসার এত ব্যাপ্তি খুব কম সাহিত্যিকের লেখাতেই খুঁজে পাওয়া যায়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময়ে ব্যাপ্ত সাহিত্যজীবনে তিনি প্রায় শতাধিক ছোট গল্প এবং পঞ্চাশের কাছাকাছি উপন্যাস রচনা করেছেন যার বিশদ আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে করা নিতান্তই অসম্ভব। আমরা শুধু তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মূল সূত্রগুলোকে চিহ্নিত করে কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের মনন তথা কথনবিশ্বকে একটুখানি বোঝার চেষ্টা করতে পারি মাত্র।

দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ যখন উত্তাল, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পোড়া বারুদের গন্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে তেমনই এক অগ্নিগর্ভ কালপর্বে কৃষ্ণদাস মজুমদার এবং শ্যামলীদেবীর সন্তান সমরেশ মজুমদার (১০ মার্চ ১৯৪৪-৮ মে ২০২৩) জলপাইগুড়ির গয়েরকাটা চা বাগান সন্নিহিত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স বছর তিনেক হতেই তাঁকে ভর্তি করা হল ভবানী মাস্টারের পাঠশালায়। সেখানে সমরেশের হয়ে পরীক্ষায় লিখে দিলেন বয়সে বড় এক দিদি। ধরা পড়ল শিশু সমরেশ। ভবানী মাস্টার উপদেশ দিলেন, তোমার তো অনেক দূর যাওয়ার কথা। আর কাউকে অ্যালাও করবে না।

সমরেশ মাস্টারমশাইয়ের এই নির্দেশটিই তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবনভর অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছেন। আর তা করেছেন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিকে দেখার পাকদণ্ডী বেয়ে। মানুষের চিন্তা ও চেতনার বিচিত্র স্তরকে, মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রবাহকে নির্মোহ দৃষ্টিতে ও একান্ত আন্তরিকতার সাথে তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তুলে এনেছেন আপন স্বকীয় ভঙ্গিতে।

উত্তরবঙ্গে জন্ম হওয়ায় উত্তরবঙ্গের বিশেষত, জলপাইগুড়ি এবং পার্শ্ববর্তী চা বাগানের আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, মানুষজন অপূর্ব বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত হয়েছে সমরেশের কথাসাহিত্যে। পাহাড় পর্বতে ঘেরা তরাই ডুয়ার্সের অপূর্ব মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি, আংরাভাসা নদী, তিস্তার কলতান, যেমন তাঁর সাহিত্যে একদিকে অপরূপ মায়া বিস্তার করে আছে তেমনই আবার পাহাড়ি অঞ্চলের শরিৎশেখর, এতোয়ারি, লোরেন, অবিরাম প্রমুখ সরল অথচ চরম

গান্ধী, পাপ্পুসোনা : সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার পাঠকের দর্পণে
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 2, Dec 2023, Pages : 22-28, ISSN 2249-4332

আত্মপ্রত্যয়ী, আদর্শনিষ্ঠ অথচ স্নেহশীল, সংবেদনশীল অথচ লড়াকু মানুষেরা তাঁর সাহিত্যকে এক বিশিষ্ট মাত্রা দান করেছে। 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ', 'মৌষলকাল'—এই উপন্যাস চতুষ্টয় ছাড়াও 'গর্ভধারিণী', 'বুকের ঘরে বন্দি আগুন' সহ বহু উপন্যাসে এবং 'অক্টোপাস', 'আংরাভাসা' ইত্যাদি একাধিক ছোটগল্পে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ। এমনকি সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত সৃষ্টি গোয়েন্দা অর্জুনও উত্তরবঙ্গেরই কিশোর। তবে বলাই বাহুল্য যে, তাঁর সাহিত্যে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের একটা বিশিষ্ট স্থান থাকলেও তা কখনোই আঞ্চলিক সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যে একটা স্থানিক পটভূমির প্রয়োজন হয় সমরেশের সাহিত্যে উত্তরবঙ্গ সেই কাজটুকুই করেছে মাত্র। অবশ্য আরও একটু অগ্রসর হয়ে যদি বলা হয় যে, সমরেশ উত্তরবঙ্গকে তাঁর সাহিত্যে এনে তাঁর জন্মভূমির প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন, তাহলে বোধহয় খুব বেশি অত্যুক্তি করা হবে না। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য যে নির্দিষ্ট কোনো স্থানিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আপামর আধুনিক মানুষের আখ্যান হয়ে উঠেছে তা তাঁর সাহিত্য পাঠে খুব সহজেই বোঝা যায়।

সমরেশ মজুমদার বলতেই আমাদের মনে প্রথমেই ভেসে ওঠে একজন রাজনীতিসচেতন লেখকের ছবি। বাস্তবিকই তাঁর কথাসাহিত্যে রাজনীতি একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে কিন্তু তাঁর সেই রাজনৈতিক দর্শনের স্বরূপ ঠিক কি তা একটু সতর্কতার সাথে অনুধাবন করা দরকার। এ প্রসঙ্গে আবারও ফিরে আসতে হয় সমরেশের বহু চর্চিত পূর্বোক্ত উপন্যাস চতুষ্টয়ের কাছে। বিপন্ন স্বাধীনতা, কংগ্রেস কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা, কংগ্রেসের স্বার্থান্বেষী মনোভাব, কমিউনিস্ট দলগুলির নেতৃত্বে সরকারবিরোধী জনবিক্ষোভ ও ধর্মঘট, চীন ভারত যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, নকশাল আন্দোলন, নকশাল আন্দোলনের শোচনীয় পরিণতির পর অধিকতর সুবিধাবাদী বাম রাজনীতির ক্রমবর্ধমান বিস্তার, নিজেদের নির্বাচনী গদি বাঁচাতে গিয়ে বাম দলগুলির ক্রমশ জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং পরিশেষে মানুষের প্রবল বামবিরোধী অসন্তোষকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের উত্থান—এক বিস্তৃত কালপর্বের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা ও বাঁকবদলকেই একান্ত বিশ্বস্ততার সাথে সমরেশ তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাস চতুষ্টয়ে। এই উপন্যাসগুলিতে ডিটেলিং এত বেশি যে এগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় সমরেশ যেন ইতিহাসের দলিল রচনা করে চলেছেন। কোথাও কোথাও একটু ক্লান্তিকর মনে হলেও (বিশেষত মৌষলকাল উপন্যাসটি) এর মধ্যে মধ্যেই সমরেশ ঠিকই স্পষ্টভাবে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনটিকে ব্যক্ত করেছেন। তিনি দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য বিপ্লবকে সমর্থন করলেও কখনই কোনো দলীয় রাজনীতিকে সমর্থন করেননি। লক্ষণীয় যে, মাধবীলতা অনিমেষের নকশাল আন্দোলনে যোগদান করার বা অর্কের উগ্রপন্থীদের সহায়তা করার কোনো বিরোধিতা না করলেও অর্ককে দলীয় রাজনীতি করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে; কারণ রাজনীতি মানুষকে অনেক ক্ষমতা দিলেও কখনই শান্তি দেয় না। এমনকি অনিমেষও পর্যন্ত বহু জনের বহু আহ্বান সত্ত্বেও জেল থেকে বেরিয়ে দলীয় রাজনীতিকে যথাসম্ভব এড়িয়েই চলেছে। আবার এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি স্বপ্নদর্শী লেখক বলে যে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল বিপ্লবেরই আবেগে বুঁদ হয়ে থেকেছেন তা মোটেই নয়। বরং এই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা যে যে কারণে এখনও সুদূরপরাহত সে বিষয়গুলোকে তিনি তাঁর উপন্যাসসমূহে খুব স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করেছেন। কোনো শ্রেণীসংগ্রামমূলক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের আগে গণচেতনার যে ব্যাপক জাগরণের প্রয়োজন এবং সেই কাজ যে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে করতে হবে তা তাঁর লেখনী থেকে স্পষ্ট। আমাদের খুব সহজেই মনে পড়বে 'গর্ভধারিণী' উপন্যাসের কথা—যেখানে সুদীপ, আনন্দ, কল্যাণ ও জয়িতা বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রাইফেল তুলে ধরেও শেষ পর্যন্ত একটি পাহাড়ি গ্রামে গিয়ে সেখানকার শোষিত,

অবহেলিত মানুষদের আত্মোন্নতির কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করাকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিল। আমাদের মনে পড়বে 'মৌষলকাল' উপন্যাসের দেবেশের মতো মানুষের কথা যে তথাকথিত কোনো বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত না থেকেও শোষকশ্রেণীর চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে আপন ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্যে বেশ কিছু অসহায় বৃদ্ধ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মনে একটুখানি আনন্দের সঞ্চার করতে চাইছে। সমরেশের কাছে কিন্তু এর মূল্যও কোনো বৈপ্লবিক কার্যকলাপের থেকে কম কিছু নয়।

মাধবীলতার উক্তিতে যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনি।

> ''.... যারা বিপ্লবের কথা বলে, মানুষ খুন করে, যারা সমাজ ব্যবস্থা বদলাতে চায় তারা তাদের রক্তাক্ত হাত ধুয়ে ফেললেও তাতে রক্তের গন্ধ থেকেই যায়। অথচ দেবেশবাবুর মতো কিছু মানুষ নীরবে যে কাজ করে চলেছেন তা কোনও অংশে বিপ্লবের চেয়ে কম নয়।''[১]

সমরেশ ঠিকই ধরেছেন যে, এ দেশের মানুষ নিজেকে ভারতবাসী বলে অনুভবই করে না। তাই এ দেশের উন্নতি অসম্ভব।

রাজনীতির পাশাপাশি মানুষের আর্থসামাজিক এবং পারিবারিক জীবনবৃত্তকেও খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সমরেশ। নির্মোহভাবে দেশের ফোঁপরা অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন সমরেশ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দৌড়'-এর বিকাশ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। 'মৌষলকাল' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং আত্মকেন্দ্রিকতার অভিঘাতে জনতা দিশাহারা, উদ্ভ্রান্ত। আবার 'তের পার্বণ' উপন্যাসের আখ্যানে উঠে আসে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের চিত্র। সেখানে আমরা দেখি গৌরব যেখানে বার বছর আমেরিকাতে থেকেও নিজের দেশীয় সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থেকেছে সেখানে তার বউদি মলির মতো বহু মানুষ এ দেশে থেকেও নিজেদেরকে ক্রমশ বিদেশী আদবকায়দায় অভ্যস্ত করে তুলতে চাইছে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর উন্নাসিকতা এবং নির্বিচার পাশ্চাত্য অনুকরণের বিষয়টি চমৎকার ফুটেছে এ উপন্যাসে। এছাড়াও মলির সাথে তার শাশুড়ীর ঝামেলা, পণের টাকা না দিতে পারায় রত্নার বিবাহবিচ্ছেদ, অভিভাবকদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও উদ্ধত আচরণের ফলে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান টিনা ও জয়ের জীবনের বিপর্যয় ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে অবক্ষয়িত আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের এক নির্মোহ আলেখ্য রচনা করেছেন সমরেশ এ উপন্যাসে। আবার তিনি তাঁর 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' গল্পটিতে দেখিয়েছেন যে, মানুষ ক্রমশ বড় হওয়ার প্রতিযোগিতায় যতই সফল হতে থাকে ততই সে ক্রমশ নিজের ব্যক্তিগত জীবনে একা হয়ে পড়ে। নিজের একান্নবর্তী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় শহর কোলকাতায় কাটানোর পর ছেলে মেয়েরা প্রবাসী হয়ে গেলে এই গল্পের অন্যতম চরিত্র সুস্নাত জীবনের প্রান্তবেলায় এসে উপলব্ধি করেন, মানুষ সারাজীবন ধরে একটার-পর-একটা সম্পর্ক স্বার্থের কারণে ছিঁড়ে ফেলে। প্রথমে স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ, বাকি পৃথিবীটা আলাদা। তারপর স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের স্বার্থ, তারপর নিজের এবং সন্তানের স্বার্থ, তারপর সন্তান আলাদা, স্বামী আলাদা, শুধু নিজের স্বার্থ। আধুনিক নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিক মানুষের এমন নির্মোহ ও নির্ভেজাল বিশ্লেষণ বোধহয় সমরেশ মজুমদারের মতো স্পষ্টবাদী সাহিত্যিকের পক্ষেই করা সম্ভব।

সমরেশ যে বিষয়েই সাহিত্য রচনা করুন না কেন, সব সময়ই তাঁর সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন থেকেছে মানুষ। তিনি তাঁর উদার মানবতাবাদী দৃষ্টি দিয়ে মানবচরিত্রের নির্মম ও নির্মোহ বিশ্লেষণ করেছেন। 'কালবেলা' উপন্যাসে বন্ধু তমাল সম্বন্ধে অনিমেষের ভাবনার মধ্য দিয়েই সমরেশ মানবচরিত্র সম্পর্কিত তাঁর বিশিষ্ট ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

> ''মানুষকে বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে আসা কখনই উচিত নয়। একটা মানুষের অনেকগুলো মুখ থাকে। তার প্রতিটি স্বতন্ত্র ধরনের। একটিকে দেখে অন্যটিকে ধারণা করতে গেলে ঠকতে হয়।''[২২]

তাই তিনি তাঁর উপন্যাসে পরস্পরবিরোধী গুণসম্পন্ন মানুষের ছবি এঁকেছেন বার বার। যে সরিৎশেখর এলাকায় নিজের দাপট ও প্রতিপত্তির জন্য পরিচিত সেই তাঁর প্রিয়তম নাতি অনিমেষের বিপদের সম্ভাবনায় ভয়বিহ্বল, যে মহিতোষ আপাদমস্তক ভদ্রলোক সেই আবার ক্ষেত্রবিশেষে চূড়ান্ত উৎশৃঙ্খল ও মদ্যপ, যে বিলু ও কিলাকে সকলে বস্তির মস্তান বলে জানে তারাই আবার মানুষের প্রয়োজনে নিজের রক্ত দান করে। এমনকি ঝুমকি ও পুষীর মতো দেহপসারিণী মেয়েরাও তাদের চারিত্রিক মাধুর্যে শেষ পর্যন্ত পাঠকদের মন জয় করে নিয়েছে। এভাবেই দোষে গুণে ভরা রক্ত মাংসের মানুষরা ভিড় করে এসেছে সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যে বার বার। এছাড়াও তিনি তাঁর ছোটগল্পে বেশ কিছু বিরল ধরনের মানুষের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে 'অক্টোপাস' গল্পের অবিরামের কথা আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি। সরকারী উদ্যোগে জঙ্গল থেকে বাচ্চা হাতি ধরার কাজ তদারক করা অবিরামের পেশা এবং এই কাজ করতে করতে এই অকৃতদার মানুষটি জঙ্গলকেই যুবতী নারীরূপে কল্পনা করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'আকাশের আড়ালে আকাশ' গল্পটির কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় যেখানে আমরা দেখি জনৈক অসহায় হতভাগিনী নারী রাণু সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় বিভিন্ন পুরুষকে নানানভাবে ভুলিয়ে তাদের সাথে অন্তত এক বার যৌন সংসর্গ করতে চায়। এমনই বহু বিচিত্র মানুষের অবাধ যাতায়াত সমরেশের কথনবিশ্বে।

নারীবাদ বলা ভাল নারীদের স্বাধিকার ও আত্মমর্যাদার বিষয়টি সমরেশ মজুমদারের কথাসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। 'সাতকাহন' উপন্যাসের সুবৃহৎ পরিসরে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে দীপাবলীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমাদের সমাজের বহু নারীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রেরা কখনও খুব সোচ্চারে কখনও বা নীরব অথচ অতিশয় দৃঢ়তার সাথে পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমরা দেখি, মাধবীলতাকে ৪২ বছর ধরে ভাবিয়েছিল দু'টি অপমান। একটি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অত্যাচার। আর অন্যটি, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে অনিমেষের দেওয়া বিবাহ-প্রস্তাব। আবার 'বুকের ঘরে বন্দি আগুন' উপন্যাসে বস্তিবাসী এতোয়ারি ও তার মা নিজেদের মতো করে তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজটাকেও নারী কিভাবে বদলাতে চায় তার প্রমাণ 'ঠিকানা ভারতবর্ষ' উপন্যাস। তবে বলা বাহুল্য যে, তিনি নারীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলতে গিয়ে পুরুষদেরকে হেয় করেননি; বরং পুরুষ ও নারীর মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানই তাঁর কাম্য। পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সহমর্মিতার ওপরই যে পারিবারিক ও সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে সেই বার্তা তাঁর উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। মাধবীলতা ও অনিমেষ, গৌরব ও জয়তী এরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। অবশ্য সাংসারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর কর্মজগতে বর্তমানে নারীদের যে প্রসার ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে তারও স্বীকৃতি ও সমর্থন মেলে। স্নেহশীল জ্যেঠিমা কাকিমার দল কিংবা কুন্তি ও দীপাবলীর মতো স্বাধীন, স্বনির্ভর নারী—সকলেই তাঁর উপন্যাসে সাদরে সমাদৃত হয়েছে। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তাঁর উপন্যাসের প্রধান প্রধান নারীচরিত্রগুলির অধিকাংশই কিন্তু রাজনীতিসচেতন; সে তারা সরাসরি রাজনীতি করুক কিংবা না করুক। মাধবীলতা, কুন্তি এরা সকলেই রাজনীতি সচেতন নারী; আবার 'গর্ভধারিণী'-র জয়িতা, 'আট কুঠুরি নয় দরজা'-র হেনা এরা তো সরাসরি বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সাথেই যুক্ত। এক কথায়, সমরেশ মজুমদার আধুনিক নারীজীবনের অন্যতম বলিষ্ঠ কথাকার।

সমরেশ আপাদমস্তক নাগরিক। গ্রামের প্রতি তার স্বাভাবিক টান থাকলেও নগরের প্রতি তার আকর্ষণ অদম্য।

অনিমেষও তাই গ্রামের প্রতি তার মমতা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত শহরেই চলে আসে। গ্রামের জন্য মন খারাপ বুকে চেপে রেখেই ক্রমশ তার নাগরিক হতে থাকা। স্বর্গছেঁড়া চা বাগান থেকে নিয়ে আসা মাটি যেমন একদিনের বর্ষণে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সেইরকম করেই তো আমাদের মধ্য থেকেও মাটির গন্ধটুকু নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এ কথা আমাদের সকলেরই জানা যে, উত্তরবঙ্গের মতো সমরেশের উপন্যাসে বার বারই ফিরে এসেছে আমাদের প্রিয় শহর কোলকাতা। কল্লোলিনী তিলোত্তমা তার যাবতীয় ঐশ্বর্য ও ঝলক নিয়ে, যাবতীয় ক্লেদ ও ক্লান্তি নিয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর তাঁর কথাসাহিত্যে। ঝা চকচকে পাঁচ তারা হোটেল থেকে শুরু করে ঈশ্বরপুকুর লেনের বস্তি পর্যন্ত সর্বত্রই সমরেশের অবাধ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ। বস্তুত, তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অন্তরাত্মা'-র উপজীব্যই হল অনিমেষের আত্মকথনে নাগরিক জীবনের ক্লেদ ও গ্লানির চিত্রায়ণ।

সমরেশের উপন্যাসে কখনও কখনও অলৌকিকতার সমাবেশ ঘটতে দেখা গেলেও বলাই বাহুল্য যে সমরেশের উপন্যাসে অলৌকিকত্বের কোনো জায়গা নেই। সেখানে তা শুধু ক্ষণিকের রহস্যময়তা সঞ্চার করে মাত্র, পরক্ষণেই তা ভেঙে খানখান হয়ে যায়। 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে ঝাড়িকাকার মেছো ভূতের গল্প কিংবা শনিবাবার অভয়বাণী অথবা স্টিমারের সাধুটির অলৌকিক ক্ষমতা সবই বাস্তবের অভিঘাতে চুরমার হয়ে যায়। প্রেমিকযুগলদের গোপন নিশাভিসার যেমন ঝাড়িকাকার মেছোভূতের গল্পকে ম্লান করে দেয়, মাধুরীর অকাল মৃত্যু তেমনই শনিবাবার অভয়বাণীকে ব্যর্থ করে দেয়। আবার যে সাধু সকলকে বাঁচানোর পথ দেখিয়ে নিজ অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে চেয়েছিল তার নিজেরই সলিলসমাধি ঘটে যায়। এই সমস্ত ঘটনার সমাবেশ সমরেশ মজুমদারকে যেন আরও বেশি করে একজন বাস্তবতাবাদী কথাকার হিসেবে প্রতিপন্ন করে।

সমরেশ মজুমদার শৈশবের অপূর্ব কথাকার। 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে তিনি স্বর্গছেঁড়ার চা বাগানের অপূর্ব মায়াময় পরিবেশে অনিমেষের যে প্রাণোচ্ছল শৈশবের ছবি এঁকেছেন তা আজ সর্বজনবিদিত। চা বাগানের বিস্তৃত শ্যামলিমা, আংরাভাসার চরে কান পেতে নুড়ির ঠোকাঠুকির শব্দ শোনা, নদীর জল থেকে খুঁজে খুঁজে লাল চিংড়ি ধরা, তিস্তার চরের আড়ালে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ অনিমেষদের যৌনতার প্রথম পাঠ এ সব কিছুই যেন এক অপরূপ রহস্যময় রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করেছে সমরেশের উপন্যাসে। 'কালপুরুষ' উপন্যাসে পুনরায় জলপাইগুড়ি ফিরে আসার সময় অনিমেষ তাই এই ভেবে আক্ষেপ করেছে যে, তার মতো সোনালি শৈশব থেকে অর্ক বঞ্চিত। শুধু বালকের শৈশব নয় বালিকার শৈশবকেও সমরেশ অত্যন্ত গুরুত্ব ও মমতার সাথে চিত্রিত করেছেন তাঁর 'সাতকাহন' উপন্যাসে। একটি বাচ্চা মেয়ের স্বাদ-আহ্লাদ, ক্রীড়াচঞ্চলতা থেকে শুরু করে ঋতুমতি হওয়া পর্যন্ত মেয়েবেলার এমন বিশদ ছবি পুরুষ ঔপন্যাসিকদের রচনায় খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তাই এই উপন্যাসগুলো পড়তে পড়তে আমরা যেন আরও এক বার আমাদের হৃত শৈশবের কাছে ফিরে যেতে পারি।

অবশ্য তিনি যে শুধু উপন্যাস ও গল্পই রচনা করেছেন তেমনটা নয়। বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং সমালোচনাসাহিত্যও তিনি রচনা করেছেন। 'কইতে কথা বাঁধে' শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থে তাঁর সমালোচকসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ কথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে কথাসাহিত্য রচনাতেই তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ হওয়ায় তিনি মূলত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবেই প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।

সর্বোপরি যে কথাটি না বললে এ আলোচনা একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেটি হল সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যের শৈলী তথা ভাষা ও বাকরীতির প্রয়োগপ্রসঙ্গ। চারপাশটাকে সমরেশ যে খুব ভাল চেনেন, তা বোঝা যায় তাঁর ভাষা ব্যবহারেও। কালপুরুষ-এর ঈশ্বরপুকুর লেনে বস্তিবাসী ছেলেদের সংলাপগুলি এর প্রমাণ। বস্তুত, দুর্ধর্ষ

থ্রিলারই হউক আর সাদা মাটা জীবনের গল্প বলাতেই হউক তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর ভাষা ও বাচনভঙ্গি এতটাই সাবলীল যে তা আমাদের কাছে অতিশয় সুখপাঠ্য বলে মনে হয়। সহজ, সরল আট পহুরে ভাষায় এই গল্প বলার অদ্ভুত দক্ষতাই তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়াও তিনি তাঁর লেখার মধ্যে এমন কিছু উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ করেছেন যা সহজেই তাঁর লেখনীর বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়। যেমন—

> ''অনি আঙরাভাসা নদীর গায়ে-রাখা কাপড়কাচার পাথরটার ওপরে এসে দাঁড়াল। চকচকে ঢেউগুলো যেন ওদের স্কুলে নতুন-আসা গম্ভীর-দিদিমণির মতো দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে কোনো দিকে না তাকিয়ে।''[৩]
>
> ''যাবার বাকি দিনগুলো কেমন দ্রুত, মুখের ভিতর নরম চকোলেটের মতো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। অনির ভীষণ খারাপ লাগছে, ভীষণ।''[৪]
>
> ''ঘরের ভেতর গাঢ় কফির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা দুধ মেশা অন্ধকার।''[৫] ইত্যাদি।

নদীর ঢেউয়ের প্রাবল্যের সাথে নবাগত দিদিমণির গাম্ভীর্যের তুলনা, দ্রুত ধাবমান সময়কে শিশুমনে মুখে রাখা চকলেটের দ্রুত মিলিয়ে যাওয়ার মতো মনে হওয়া কিংবা থমথমে আলোআঁধারি পরিবেশকে দুধ মেশানো কফির রং-এর সাথে উপমিত করা বাস্তবিকই আমাদের মনে এক অন্য রকমের বিরল অনুভূতির আস্বাদ দেয়।

সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র অর্জুনের গল্প অবলম্বনে এবং 'কালবেলা' ও 'বুনো হাঁসের পালক' উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ হয়েছে বিখ্যাত বাংলা ছবি। শুধুমাত্র রূপোলি পর্দাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তাঁর সৃষ্টি, ছোট পর্দাতেও তিনি তাঁর ছাপ রেখে গিয়েছেন। বাংলা সিরিয়ালের আদিপর্বে সমরেশ মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'তেরো পার্বণ' বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

বহু অসাধারণ সাহিত্যের রূপকার এই সাহিত্যিক তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার অর্জন করেছেন। ১৯৮২ সালে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৮৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ২০০৯ সালে বঙ্কিম পুরস্কার এবং আইআইএমএস পুরস্কার জয় করেছেন। চিত্রনাট্য লেখক হিসাবে জয় করেছেন বিএফজেএ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির এওয়ার্ড। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'বঙ্গবিভূষণ' খেতাবে ভূষিত করেছে।

শেষ পর্যন্ত সমরেশ একটি যাত্রাপথের পর্যটক। যিনি দিয়ে যান আগামীর জন্য পরামর্শও ঃ জন্ম থেকেই দৌড়ে যাচ্ছি আমরা। প্রত্যেকেই একটা লক্ষ্যের দিকে ছুটছি। একটু অসতর্ক হলেই হেরে যেতে হবে। সব শেষে সমরেশ মজুমদার সম্বন্ধে এ কথাই বলা যেতে পারে যে, এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিরূপ বিশ্বে দ্বন্দ্বজর্জর আধুনিক মানুষের যে বিচিত্রমুখী জীবনপ্রবাহ সমরেশ মজুমদার আসলে সেই জটিল জীবনপ্রবাহেরই রূপকার।

তথ্যসূত্র

১. সমরেশ মজুমদার, মৌষলকাল, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার বাংলাদেশ, সুলভ প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ১৪২০ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, পরিচ্ছেদ ৩৭, পৃ. ২৬২।

২. সমরেশ মজুমদার, কালবেলা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২০, চতুর্থ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৫, পরিচ্ছেদ ১৬, পৃ. ২১১।

৩. সমরেশ মজুমদার, উত্তরাধিকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, হীরক জয়ন্তী সংস্করণ মাঘ ১৪২৫, পরিচ্ছেদ ১, পৃ. ৪।

OPEN EYES

৪. তদেব, পৃ. ৪।

৫. সমরেশ মজুমদার, আট কুঠুরি নয় দরজা, পরিচ্ছেদ ৪।

গ্রন্থপঞ্জী

১. সমরেশ মজুমদার, উত্তরাধিকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, হীরকজয়ন্তি সংস্করণ মাঘ ১৪২৫।

২. সমরেশ মজুমদার, কালবেলা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪২০, চতুর্থ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৫।

৩. সমরেশ মজুমদার, কালপুরুষ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫, দ্বাবিংশ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৭।

৪. সমরেশ মজুমদার, আট কুঠুরি নয় দরজা, ওয়েব সংস্করণ, accessed from www.ebanglalibrary.com, accessed on 02-06-2023।

৫. সমরেশ মজুমদার, তের পার্বণ, ওয়েব সংস্করণ, accessed from www.ebanglalibrary.com, accessed on 03-06-2023।

৬. সমরেশ মজুমদার, গর্ভধারিণী, ওয়েব সংস্করণ, accessed from www.ebanglalibrary.com, accessed on 04-06-2023।

৭. সমরেশ মজুমদার, বুকের ঘরে বন্দি আগুন, ওয়েব সংস্করণ, accessed from www.ebanglalibrary.com, accessed on 02-06-2023।

৮. সমরেশ মজুমদার, ঠিকানা ভারতবর্ষ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪।

৯. সমরেশ মজুমদার, দৌড়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ মে ১৯৭৬, একাদশ মুদ্রণ মার্চ ২০০৮।

১০. সমরেশের সেরা ১০১ (গল্পসংকলন), ওয়েব সংস্করণ, accessed from www.ebanglalibrary.com, accessed on 02-06-2023।

১১. সমরেশ মজুমদার, কইতে কথা বাঁধে, ওয়েব সংস্করণ, accessed from www.ebanglalibrary.com, accessed on 02-06-2023।

১২. সমরেশ মজুমদার, মৌষলকাল, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার বাংলাদেশ, সুলভ প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ১৪২০ বঙ্গ ব্দ, তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৯।

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা।

১৪. দেশ পত্রিকা।

পাপ্পুসোনা গান্ধী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
মিরাণ্ডা হাউস কলেজ, দিল্লী

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প : পরিবেশ ভাবনার নিবিড় পাঠ

রাখিমা দাস

বর্তমানকালে বাংলা সাহিত্যালোচনায় পরিবেশ ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পে পরিবেশ ভাবনার নিবিড় পাঠ আসলে প্রচলিত সাহিত্য চিন্তার ধারণা থেকে বেরিয়ে বিপন্ন পরিবেশ, পরিবেশ দূষণ ও আধুনিক মানুষের আগ্রাসী মনোবৃত্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠে। এই আলোচনা পত্রে পরিবেশ ভাবনা ও পরিবর্তমানতা একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ পরস্পর সম্পর্কিত। মানুষ যখনই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহুরে হয়েছে, তখন থেকে নানান সমস্যা জীবনে দেখা দিয়েছে। আসলে প্রকৃতির সংলগ্নতাই সুস্থভাবে বাঁচার অন্যতম চাবিকাঠি। প্রকৃতি ও পরিবেশ যদি বিশুদ্ধ না থাকে তাহলে সমস্ত সভ্যতাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। পরিবেশ বিপন্ন, ফলত সমাজ জীবনে এসেছে অনেক ধরণের সংকট। বর্তমানে উন্নয়নের জোয়ারে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। মাটিতে রাসায়নিক সার, নির্বিচারে গাছ কাটা, এমনকি কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ দেশ-কাল-জাতির সীমারেখা পেরিয়ে পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। ইদানিংকালে খাবারে ভেজাল, জলে আর্সেনিক, সব্জিতে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, দুধে পাউডার মেশানো ইত্যাদি ঘটনা আমরা প্রায়শই খবরে দেখছি, পেপারে পড়ছি। বিষাক্ত দ্রব্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে চলেছে। কিন্তু আমাদের সেই বিপর্যয়ে পড়তে হয়নি বলে আমরা উদাসীন থাকি। বাস্তবে এর প্রভাব সকলের ওপরে পড়ে।

বিপন্ন বসুন্ধরাকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন হচ্ছে তেমনি কলম হাতে এগিয়ে এসেছেন সংবেদনশীল কবি, সাহিত্যিকরাও। পরিবেশ সচেতনতামূলক সাহিত্যকে 'ইকো টেক্সট' এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় বলা যায় 'সবুজায়নের সাহিত্য'। সাহিত্যিকরা সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন মানব সভ্যতা এখন ক্রমশ অন্ধকার অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অনুভূতিরই রূপ পাচ্ছে বিচিত্র সাহিত্য সংরূপে।

পরিবেশ সংক্রান্ত নানান সমস্যা যাঁদের লেখায় দেখা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। সাম্প্রতিককালে পরিবেশকেন্দ্রিক নানান সমস্যা তাঁর সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। এইসব সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য ছাড়াও পরিবেশগত একটা মূল্য রয়েছে। বর্তমানে পরিবেশকেন্দ্রিক বিষয় যেমন পরিবেশ বিজ্ঞানীদের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, তেমনি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পেও গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা উঠে এসেছে। মানুষ ও পরিবেশের এই অসুস্থ সম্পর্ক স্বপ্নময়ের বেশ কিছু গল্পে ভাষা পেয়েছে। পরিবেশ সচেতনতা কম বেশি অনেক গল্পেই ধরা পড়েছে যেমন—'চারণক্ষেত্র', 'ক্যারাক্কাস', 'ফুল ছোঁয়ানো', 'আর্সেনিক ভূমি', 'মানুষ ও বেগুন', 'আবর্জনা হইতে ভোগ্যপণ্য', 'শনি', 'সতর্কতামূলক রূপকথা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'উইশ' গল্পে। নিম্নে তাঁর বিশেষ কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা করা হল।

'শনি' গল্পটি 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় ১৯৮৭-তে তেজস্ক্রিয়তার সমস্যা নিয়ে লেখা। পরিবেশ দূষণের জন্য বেশীরভাগ

দাস, রাখিমা : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প : পরিবেশ ভাবনার নিবিড় পাঠ
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 2, Dec 2023, Pages : 29-35, ISSN 2249-4332

ক্ষেত্রে দায়ী মানুষের লোভ। লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ক্ষতি করার পাশাপাশি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের। 'শনি' গল্পটির বীজটা হচ্ছে একটা খবরের কাগজ-এর রিপোর্ট। লেখা আছে যে পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরির যে দুধ বাংলাদেশে আসে তার উপরে ব্যান করা হয়েছে। বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে, সেই দুধ এখন পশ্চিমবাংলায় চলে আসছে। এর কারণ ওই রিপোর্টে ছিল। চেরনোবিলে একটা এক্সপ্লোশন হয়েছিল, তাতে কিছু পারমাণবিক ছাই পোল্যান্ডের তৃণভূমীতে পড়েছে। গরুরা ঐ ঘাস খেয়ে রেডিও অ্যাকটিভ হয়ে গেছে এবং সেইগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিক্রি করা হোচ্ছে।[১] এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে রচিত 'শনি' গল্পটি।

'শনি' গল্পটিতে উঠে এসেছে গুঁড়ো দুধে রেডিও বিষ-এর কথা। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাজুদ্দীন, তার স্ত্রী হাসুনারা গর্ভবতী হওয়ায় বিপ্রদাসবাবুর বাড়িতে শনি পুজো দিতে আসে। সেখানেই গুঁড়ো দুধ মেশানো সিন্নি খেয়ে ভালো লাগায় বিপ্রদাসবাবু গুঁড়ো দুধ বিক্রি করার পরামর্শ দেয়। ঝাউডাঙার ভোমরার বিল মৌজায় তাজুদ্দীন-এর ছোট্ট মুদীর দোকান। সে ব্যবসায়ী মানুষ, মুনাফার লোভ ছিল। বাংলাদেশি পাউডার দুধের হঠাৎ আমদানির কারণে গুঁড়ো দুধ হঠাৎ সস্তা হওয়ায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। খুব সস্তায় সহজলভ্য বলে তাজুদ্দীন লাভের কথা ভেবে দোকানে বিক্রি করতে থাকে। এক টাকার গুঁড়ো দুধে তিন পোয়ার মত দুধ হয়ে যাচ্ছে। তাজুদ্দীনের স্ত্রী হাসুনারা গর্ভবতী—

> "এ সময় পুষ্টির খাবার খাওয়ানো বড় জরুরি। তাজুদ্দীন খুব দুধ খাওয়াচ্ছে। সস্তার দুধ। মিলিক পাউডার। গরম জলে ক'চামচ গুলে দাও, ব্যাস দুধ হয়ে গেল।"[২]

তাজুদ্দীনের ঘরে এখন অনেক দুধ। হাজীসাহেবের কাছে সে শোনে রাশিয়া-টাশিয়া দেশ থেকে এই গুঁড়ো দুধ আসছে। এই দুধের মধ্যে এমন খারাপ জিনিস মিশোচ্চে যাতে জাতি কমজোরি হয়। এই গুঁড়ো দুধ বিষাক্ত। গর্ভবতী মহিলারা খেলে বিকলাঙ্গ সন্তান হতে পারে। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞান কি জানে না, বোঝে না। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যে যা বলে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করে। তাজুদ্দীন দিশাহারা হয়ে পড়ে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর শুনে তার রাতের ঘুম উড়ে যায়। সে শোনে—

> "এই গুঁড়ো দুধ বাংলাদেশ পোল্যাণ্ড থেকে আমদানি করে। বেশ কিছুদিন আগে রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিম সিমান্তে অবস্থিত চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই দুর্ঘটনার পরে পারমাণবিক ছাই-এর কিছু অংশ পোল্যান্ডের চারণক্ষেত্রের ওপর পড়ে। ফলে ঐ অঞ্চলের ঘাস ও শস্য তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ঐ অঞ্চলে পশুদুগ্ধেও তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া যায়। সেই দুধ থেকে যে গুঁড়ো দুধ তৈরি হয়েছিল, সেই গুঁড়ো দুধ পোল্যাণ্ড বাংলাদেশ রপ্তানি করে দেয়। বাংলাদেশের বিজ্ঞানকর্মীরা ঐ দুধে রেডিও অ্যাকটিভিটি শনাক্ত করেন। বিজ্ঞানকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের চাপে বাংলাদেশ সরকার গুঁড়ো দুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।"[৩]

তাজুদ্দীন মূর্খ মানুষ, অত শত কথা বোঝে না। রেডিও বিষ, চেরনোবিল কি তা জানে না। সে পিতা হতে চলেছে, নবজাতক সুস্থ হোক, ভালো হোক এই কামনা করে। দিশাহারা তাজুদ্দীন কোনো আশ্বাসেই সে বিশ্বাস রাখতে পারে না। আল্লা-ভগবান, তাবিজ, মাদুলি কাকে বিশ্বাস করবে সে? তাই সে মনে প্রাণে প্রার্থনা করে সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে লাথি মেরে ভাল সুস্থ সন্তানের আগমন হোক। সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিবেশ মানুষ নিজেই তৈরি করেছে। ক্ষমতায়ন আর লোভ সভ্যতার উন্নয়নের নামে সুস্থ পরিবেশকে বিপন্নতার দিকে নিয়ে। ফলস্বরূপ মানব সমাজ বর্তমান প্রজন্মকে যেমন ধ্বংস করছে তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে করছে বিকলাঙ্গ। লেখক সেই প্রশ্ন আমদের

সামনে তুলে ধরেছেন।

'ক্যারাক্কাস' (শারদীয় বর্তমান, ১৯৯২) যন্ত্র-প্রযুক্তি মানুষকে কিভাবে যন্ত্রদাস বানায় তারই কথা বলেছেন এই গল্পে। তাঁর 'শ্রেষ্ঠগল্প'-এর ভূমিকাতে নিজেই লিখেছেন—"আমার শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়, যৌবনে গ্রামকে দেখেছি খুব কাছ থেকে। কয়েকটি গল্পে রয়েছে কাছ থেকে দেখা গ্রামজীবন। একটা সময় আমার মনে হয়েছে প্রযুক্তি-মস্তানি মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। যে প্রক্রিয়া ভূমিদাস করে, সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়।"[৪] এই অনুভবেরই গল্প হল 'ক্যারাক্কাস'।

শিল্প বিপ্লবের ফলে সভ্যতার উন্নয়নে ঘটে চলেছে শিল্পঘটিত দূষণ। শিল্প শুধু সবসময় উন্নয়নের সহায়ক নয়, কখনো কখনো মানবের বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে। শিল্পকেন্দ্রিক দূষণ ও কল-কারখানার কুফলে সৃষ্ট বিকৃত প্রাণীজগৎ ও অসুস্থ মানসিকতার ছবি গল্পে যেমন দেখতে পাই। তেমনি দেখতে পাই পরিবেশ দূষণকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির উচ্চবিত্ত মানুষ মুনাফা লাফ করতে চেয়েছে ফলস্বরূপ আগামী প্রজন্মের ক্ষতিসাধন করছে।

গল্পের শুরুতেই দেখি কারখানার টারজান নামক এক রোবটের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা এক শ্রমিক মনখারাপের দিনে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় কারখানার কাছে বিষপুকুরে। সেখানে জল জল নয়, অ্যাসিড। অ্যালডিহাইড-কিটোন-আর্সেনিক সোডা মিশ্রিত জল, কারখানার জলে কি আছে না আছে শ্রমিকটি না জানলেও এটা ঠিক বোঝে পরিবেশ বিপন্ন, গাছপালা থেকে কেমন পাতা ঝরে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। সে দেখে—

> "এই পুকুরের পাশে একটা গাছ আছে। গাছের মতন বহু গাছ ছিল। মরে গেছে। পাতাগুলো সব সেই কবে ঝরে গেছে, আর ওঠেনি। কাঠ আছে। মরা কাঠ, কাঠের শরীর ... এখানে মাটিতে কোন ঘাস নেই। পুকুরের কাদার রং ভারী অদ্ভুত।"[৫]

সে দাঁড়িয়ে বিষপুকুরে শোভা দেখতে গিয়ে বিষপুকুরে লক্ষ করে বুটবুটির তলায় এক নতুন ধরণের মাছ। বিষজলে নতুন প্রাণ জন্ম নিয়েছে। কারখানার স্যারকে জানালে তিনি বিষজল থেকে বিচিত্র মাছ ধরেন—"হাত খানেক লম্বা। ড্যাব্যা-ড্যাব্যা চোখ। সারা গায়ে আঁশ নেই একটুও। খরখরে গা। গিরগিটির মতন।"[৬] এই নিউ গেস্ট, নিউ স্পেসিস, নতুন প্রজাতিটির নাম দিলেন ক্যারাক্কাস। স্যার জোর করে প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য শ্রমিককে ঠেলে ফেলে দেয় বিষজলে। বিষাক্ত জলে শ্রমিকের চেহারার পরিবর্তন আসে। চামড়াটা কী রকম খড়খড়ে হয়ে যায়, গিরগিটির চামড়ার মতন কালো, কুঁচকানো, চুলগুলো সাদা, ভ্রু সাদা, চোখ বের হয়ে আসছে। শ্রমিকের বীভৎস চেহারা দেখে তার বউ ভয় পায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব তৈরী হয়। এই চেহারা দেখে কারখানার অন্য শ্রমিকরাও ভয় পায়। অ্যাটেনশন নষ্ট হচ্ছে। ফলত সিনেমার হিরোর মত সুন্দর মুখোশ দেওয়া হয়।

এদিকে বিষপুকুরে নতুন প্রজাতি ক্যারাক্কাসের বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। কোম্পানি বিষপুকুরে আজব মাছের চামড়া দিয়ে গ্লাভস বানাবে, অ্যাসিড প্রুফ, রেডিও অ্যাকটিভিটির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এপ্রন বানাবে, মুখোশ বানাবে। এই পুকুরের জল কিনে আমেরিকা, জার্মানি বিজনেস করতে চাইছে। কোম্পানি লাভের জন্য এরকম অনেক বিষপুকুর, সারপুকুর বানাবে, অনেক মাছ চাষ করবে। বিষজ জলেই যেহেতু তাদের জন্ম ও বিস্তার তাই বিষ জলের উৎপাদন ও বাড়তে থাকে ক্রমশ।

ক্যারাক্কাস মাছের চামড়ায় তৈরী হচ্ছে গম্ভীর গম্ভীর মুখের মুখোশ। এই ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন মুখোশের হেভি দাম। অ্যাসিড-অ্যালকালি প্রুফ। ফায়ার-রেডিও অ্যাকটিভিটি প্রুফ। হঠাৎ কোম্পানির সাহেব সুবোদের চিন্তায় মাথায় হাত পড়ে যায়। দুশ্চিন্তা গ্রাস করে। কারণ ম্যানেজমেন্টদের লোভ এবং অদূরদর্শিতার জন্য একটি নতুন প্রজাতি

সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কারখানার আকস্মিক অ্যাসিড লিক হলে অন্যান্যদের ক্ষতি হলেও শ্রমিকটির গায়ের চামড়া গিরগিটির মত হওয়ায় সে নিরাপদ থাকে। এই ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ নতুন সারক্যুলার ইস্যু করে। সব শ্রমিককে বিষপুকুরে স্নান করতে বলে। তবে কেউ রাজি হয় না। কেউ গিরগিটি হতে চাইল না। ইতিমধ্যে গল্পকথকের স্ত্রী বীভৎস দর্শন সন্তান প্রসব করে। শ্রমিকের স্ত্রীও ওই বিষ পুকুরে স্নান করে স্বামীর মত হয়ে যায়। বিষাক্ত দুজন দম্পতির মিলনে জন্ম নেয় ভূতের মত এক অদ্ভুত সন্তান। এ যেন পেত্নীর গর্ভে ভূতের জন্ম হল ছেলেটার চামড়া ঝোলা ঝোলা। সারা চামড়ায় গুঁড়ি গুঁড়ি কাঁটা। কারখানার স্যার নবজাতককে দেখতে আসেন—

> "স্যার চামড়া টিপে টিপে দেখছেন, শিশুর চামড়া। স্যার স্যাম্পল দেখছেন, স্যাম্পল। স্যারের চোখ চকচক। নিঃশ্বাস ঘন ঘন। স্যার আমার ছেলের চামড়া টিপছেন, কাপড়ের জমিন দেখার মত শিশুর ঝুলে থাকা চামড়ার দুপাশে আঙুল লাগিয়ে ঘষছেন। ... মন্ত্র পড়ার মত বলতে থাকলেন-ইউরেকা ... ইউরেকা ... নতুন প্রজাতি। নিউ স্পেসিস। ক্যারাক্কাস ... নিউ ক্যারাক্কাস..."।[৭]

শিশুদের পুকুরে ক্যারাক্কাস শেষ হলেও মানুষের মধ্যে ক্যারাক্কাস এসেছে। অসহায় পিতা মুখোশের আড়ালে হাসি হাসি মুখ নিয়ে প্রত্যক্ষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। প্রত্যক্ষ করে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ শিশুদের।

'আর্সেনিক ভূমি' (শারদ পরিচয়, ২০০১) আমরা জানি জলই জীবন কিন্তু বর্তমানকালে জলদূষণ বিশেষ করে আর্সেনিক দূষণ মানুষের মনে বিভীষিকা তৈরী করেছে। মানুষ আর্সেনিকযুক্ত জলপান করে সচেতন-অচেতন নানাবিধ মারণ রোগের শিকার হচ্ছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পের পরিসরে 'আর্সেনিক ভূমি' গল্পটিতে উঠে এসেছে আর্সেনিক দূষণ-এর কথা। এই গল্পে আর্সেনিক আক্রান্ত বাকিলা গ্রাম ও গ্রামবাসীর যাপনবৃত্তান্ত লিখেছেন। গল্পকথক কর্মসূত্রে আমেরিকাবাসী রামপ্রসাদ মণ্ডল। তার বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য চল্লিশ বছর পর নিজেদের দীর্ঘদিনের ফেলে আসা জন্মভিটে বাকিলা গ্রামে আসে, গ্রাম ও গ্রামবাসীদের জন্য কিছু করার অভিপ্রায় নিয়ে। ইণ্ডিকা গাড়ি ভাড়া করে দু'লিটার মিনারেল ওয়াটার ও ফ্লাক্সে একটু চা নিয়ে বহুবছর পরে নিজেদের গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের পথে প্রাকৃতিক শোভা তাকে নস্টালজিক করে তোলে। মনে পড়ে যায় কত পুরানো স্মৃতি, বন্ধু জয়নাল-এর ঢাক বাজানোর কথা, যার ঢাকের বোল রামপ্রসাদ বুঝতে পারত। গ্রামে আসার পথে একটা নীল বোর্ডের লাল হরফের লেখার ওপর নজর পড়ে। তাতে লেখা আছে—"সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নলকূপের জলে বিপদসীমার বেশি আর্সেনিক আছে। ওই জল পান করিবেন না।"[৮] মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা আঁকড়ে ধরে ভাবতে থাকে ব্রাজিল, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মালয়েসিয়াতেও এই প্রবলেম। আমাদের দেশের বাড়ির জলেও কি আর্সেনিক আছে? আমাদের এদিকে কতগুলো ব্লক আর্সেনিক অ্যাফেকটেড, গভর্মেন্ট কি সারফেস ওয়াটার ট্রিট করে পাইপ লাইনে পাঠাচ্ছে? এখানকার মানুষ আর্সেনিক জলের বদলে কি খায়? আর্সেনিক দূষণ নিয়ে ভাবতে ভাবতে এসে পড়ে 'সুন্দরপুর কৃপাসিন্ধু আদর্শ হাইস্কুলে'। এই স্কুলের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র রামপ্রসাদ। স্কুলে গিয়েও দেখে কলতলার টিউবয়েলটা একটা বস্তা দিয়ে ঢেকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছেলেরা কী জল খায়? সেই প্রশ্নের উত্তরে হেডস্যার বলেন—ছেলেরা এই জলই খায়। কী করবে! বস্তাটাকে কলের মুখের কাছে ফুটো করে নিচ্ছে। বাড়ি থেকে জল আনলেও তো ওই একই ব্যাপার। এ তল্লাটে সব টিউবওয়েলের জলেই আর্সেনিক। এই আর্সেনিক দূষণ বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু নিজ এলাকায় নয় আশেপাশেও এই দূষণ ছড়িয়েছে। রামপ্রসাদ ভাবে—

"একশো থেকে পাঁচশো ফুট পর্যন্ত জলে আর্সেনিক থাকতে পারে। এমনিতে মাটির তলায় আর্সেনিকের যে পিরাইটস থাকে, সেটা জলের সঙ্গে থাকতে পারে না। অক্সিজেন মিশলে আস্তে আস্তে জলে মিশতে পারে। মাটির ভিতর থেকে জল তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে মাটি একটু করে ফোঁপরা হচ্ছে, ফলে অক্সিজেন ঢুকছে। ঢুকে আর্সেনিক পিরাইটসকে ওয়াটার সল্যুবল করে দিচ্ছে। এ অঞ্চলে এটাই ফেনোমেনন। মাটির গভীরে পিরাইটস লেয়ার অক্সিডাইসড হতে পারে না, তাই সাত-আটশো ফিট কনটামিনেশন হয় না।"[৯]

গ্রামের জন্য স্কুলের জন্য কিছু করতে মন চায় রামপ্রসাদের। গ্রামে প্রবেশ করে দেখে গ্রামের চেহারায় বদলে গেছে। অধিকাংশ মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত। কারও ভ্রুতে চুল নেই, তো কারও আঙুলে কালচে ছোপ, আর্সেনিকোসিস হলে যেমন হয়। সামাজিক পরিস্থিতিরও বদল ঘটেছে। আর্সেনিক জল খেয়ে মরার চেয়ে ডাকাতি করে মরাকে শ্রেয় বলে মনে করে। ওরা জেনে গেছে ওদের জীবনের দাম নেই, এমনিতেও মরবে অমনিতেও মরবে। ওই গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিয়ে পর্যন্ত হয় না। কেউ জেনে শুনে মেয়ে দিতে চায় না।

এই গ্রামে ঘর সংসার জীবনের কোনো মূল্য নেই, শুধু একটা করে ভোট আছে। রামপ্রসাদের নিজের পরিবার পরিজনদের মধ্যেও অনেকে আর্সেনিক আক্রান্ত হয়েছে, কেবল বাচ্চাগুলো এখনো এই দূষণের কবলে পড়েনি। রামপ্রসাদ বুঝতে পারছে প্রতিকার না করলে কাউকে ছাড়বে না, তাদেরও শেষ করে দেবে। সরকার প্রশাসন শুধু সাবধান করে, নির্বিকার অবস্থান করেছে। শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কার্যকরী হয়নি। সবাই জেনেশুনেই বিষজলই খায়। রবীন্দ্রনাথের গানটার কথা মনে পড়ে যায় এ প্রসঙ্গে—

"আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।" (মায়ার খেলা, গীতিকা)

এভাবে গল্পের বয়ানে চলে আসে পরিবেশ, সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক দিকগুলি।

সরকার নির্বিকার থাকলেও রামপ্রসাদ গ্রামের মানুষদের জন্য অনেক কিছু করার পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখি তার প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও আর্সেনিক ভূমির জন্য দশ-বারো লাখ খরচ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। এই দূষণ শুধু প্রাকৃতিক নয়, আত্মিকও বটে। রামপ্রসাদের বিবেকও দূষণ মুক্ত হতে পারেনি। তাই তার আত্মজিজ্ঞাসা—

"পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি বিশুদ্ধ জল পান করছি। আর্সেনিক আস্তে আস্তে মারে। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বিশুদ্ধ জল, জীবাণুহীন জল কি আমায় আস্তে আস্তে মেরেছে?"[১০]

শেষ পর্যন্ত বাবার ইচ্ছাকে অপূর্ণ রেখে বিষাদময় কালচে করুণ আর্সেনিক ভূমিকে ফেলে রেখে ফেরার প্রস্তুতি নেয় রামপ্রসাদ। গ্রামের মানুষ আর্সেনিক বিষ পান করার পাশাপাশি, অর্থবান ব্যক্তির সহৃদয়তার অভাবও গল্পে অন্যমাত্রা সংযোজন করে।

'ফুল ছোঁয়ানো' এই গল্পে লেখক আর্সেনিক আক্রান্ত মৃত্যুর প্রহর গোনা আসগর আলির গল্প শুনিয়েছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র হীরকের মাধ্যমে উঠে আসে আর্সেনিক আক্রান্ত বাঁশপোঁতা গ্রামের এক দরিদ্র মুসলমান পরিবারের গভীর জীবন সমস্যার কথা। হীরক বাঁশপোঁতা গ্রামে আসগর আলির বাড়ি এসে জানতে পারে এই গ্রামের আর্সেনিক দূষণের কথা। আর্সেনিকের প্রভাবে আসগরের "চুল ও দাড়ি সাদা, রোগা চেহারা। ... ওর নখের রং কালো, হাতের চামড়া গিরগিটির গায়ের মত খরখরে।"[১১] আর্সেনিক দূষণের জন্য জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য ডাক্তার লেকচার দেয়। ওদের ছবিও ওঠে কাগজে। কাগজে হেডিং হয় 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।' সংবাদপত্রে বার হয়

পশ্চিমবাংলার ৮ টি জেলায় ৩২ লক্ষ মানুষ বিপদ মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক যুক্ত জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। এর মধ্যে দশ হাজার মানুষ এখন আর্সিনিকোসিস রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে তিন হাজার মানুষ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। সরকারি হাসপাতালে আর্সিনিকোসিসের চিকিৎসার বিষয়ে আয়োজিত কর্মশালায় আসগর আলি স্বরচিত পালা পড়েন পদ্যছন্দে—

মরণ রয়েছে লেকা পানির ভিতরে।
মরণ বেঁধেছে বাসা শরীর গভীরে।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শুনি মরণের গান।
আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। ...
পৃথিবীর বক্ষ হতে অমৃত তুলিল
আর পৃথিবীর ভিতরেতে বিষ জন্মে গেল
সে বিষ কে সরাবে, কে ঘুচাবে ভাই—
কালীয় সর্প আছে শ্রীকৃষ্ণ তো নাই।"[১২]

আসগর আলির পালায় শোনা যায় হিন্দু পুরাণের নতুন ভাষ্য—"ত্রেতা যুগে কালিন্দীর দহে লুকিয়ে ছিল কালিয় সাপ। তার হাজারটা মুখ, আর মুখের ভিতরে বিষ জমা হলিই ঢেলি দিত কালিন্দীর পানিতে। আর ওই কালিন্দীর সঙ্গে ছিল যমুনার যোগাযোগ। সে কারণে যমুনার পানিও হয়ে গেছিল বিষাক্ত। বৃন্দাবনের লোক পানি খেতে পারে না।"[১৩] শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করেছিলেন। কিন্তু এযুগে শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? আর্সেনিক আক্রান্ত গরীব মানুষদের কে রক্ষা করবে? মাটির তলায় জল বিষ হয়ে গেছে। কলকাতার ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল।

আসগর কাদিরহাটি গ্রামে ডিপটিউকল চালায়। "মাটির তলার পানি বের করি মা বসুন্ধরার তো বিশ্রাম নেই, কতবার ফসল দিতি হয়। আউস, আমন, বোরো...। হাইবিরিড ধান পানি টানে বেশি, আর ওই পানিতে আর্সেনিক। ধানের ভিতরেও কি সেই আর্সেনিক মেসে না?"[১৪] কিন্তু উপায় নেই এই জলই খেতে হয় বাধ্য হয়ে। অগত্যা প্রতিদিন আর্সেনিক যুক্ত জল পান করে। যাদের জ্বালানির সঙ্গতি নেই, তারা জল ফুটিয়ে কী করে খাবে? কলকাতার লোক পুণ্য বলে ভাল বিশুদ্ধ জল পায়। গ্রামের মানুষরা পায় না। সরকার, প্রশাসন নীরব। ভোট দিলেও তারা এ বিষয় উপেক্ষা করে। কোনো গণসচেতনতা ও গণআন্দোলন নেই। আশেপাশে দশ বারোটা গ্রামে কমসেকম একশো জন আসগরের মত আর্সেনিক আক্রান্ত। এমন অবস্থা হয়েছে এদিকের গাঁয়ে ছেলেমেয়েদের বিয়ে সাদী হয় না। কেউ মেয়ে দিতে চায় না। গ্রামে ছোটো ছোটো মেয়েরা ফুল ছোঁয়ানোর কাজ করে, ফুল ছোঁয়ানো মানে—

"ফুলে ফুলে আঙুল ছোঁয়াতি হয়। ... পটলের ফুল এল। এখন তো পজাপতি টজাপতি ফরিং টরিং নেই, পোকা মারার বিষে সব শেষ। এ ফুলের রেণু ও ফুলি না লাগলে বীজ হবে কী করে?"[১৫]

ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রজাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফুলের মতো নিষ্পাপ বাচ্চাগুলো তো নিরপরাধ, জ্ঞানপাপী মানুষ জেনে শুনে তাদের হাতে বিষ জল তুলে দিচ্ছে। পরিবেশ সুস্থ হয়ে উঠলে আগামী প্রজন্ম প্রজাপতির মতো নিষ্পাপ সুন্দর হবে।

কর্মজীবন সূত্রে অর্জিত বহুবিধ বাস্তবিক অভিজ্ঞতা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্যের উপকরণ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের মানুষজনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের জীবনের সমস্যাগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দক্ষ শিল্পীর মত পরিবেশ বিষয়ক বাস্তব সমস্যাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি পরিবেশ সচেতন

লেখক, মনে প্রাণে দূষণ রোধ করার জন্য নিষ্ঠুর সত্যের উদ্‌ঘাটন করে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন। সামাজিক দায়কে স্বীকার করে নিয়ে পরিবেশ সংকটের চিত্র তুলে ধরে তিনি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সঙ্গে কিছুক্ষণ, সাক্ষাৎকার, অমৃতলোক, শারদ ১৪০৩, পৃ. ১০৯।
২. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', ('শনি'), দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৭৮।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।
৪. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা অংশ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, কলকাতা।
৫. পূর্বোক্ত, ('ক্যারাক্কাস'), পৃ. ১২৫।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।
৮. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'পঞ্চাশটি গল্প', ('আর্সেনিক ভুমি'), আনন্দ পাবলিকেশন, জানুয়ারী ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ৫৫।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।
১১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', ('ফুল ছোঁয়ানো'), দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ২৫১।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬।

রাখিমা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফুল্ল রায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিবর্তিত সমাজ ও মূল্যবোধের রূপায়ণ

মাধবী বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সঠিক ধারণাকে বলা হয় মূল্যবোধ। সাধারণত ধনাত্মক হিসেবেই এই শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রভাবে সমাজ ও সমাজে প্রচলিত এই মূল্যবোধ বদলে যেতে পারে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি বাঙালির জীবনে শুধু আনন্দেরই হয়নি। বাংলার একটি অংশ অন্য দেশে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রাপ্ত 'স্বাধীনতা' বাঙালির কাছে আনন্দের সাথে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও মানুষের মধ্যে দাঙ্গা ও হানাহানি দেখা গিয়েছিল। পরিস্থিতির চাপে সমাজজীবনে এসেছিল পরিবর্তন। বদলে ছিল মানুষের মূল্যবোধ। বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতা পরবর্তী পরিবর্তিত সমাজ ও পরিবর্তিত মূল্যবোধের গল্প শুনিয়েছেন যে কজন কথাসাহিত্যিক তাঁদের মধ্যে প্রফুল্ল রায় অন্যতম। কোনও তাত্ত্বিকতার কথা না বলে বা দেশবিভাজনের কারণ নির্দেশ না করে তিনি সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের গল্প শুনিয়েছেন। যে গল্পে আমরা স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিবর্তিত সমাজ ও মূল্যবোধের পরিচয় পাই। বর্তমান প্রবন্ধে প্রফুল্ল রায় রচিত কয়েকটি ছোটগল্প পর্যালোচনা করে উল্লেখিত বিষয়টিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ : দেশভাগ-পরিবর্তিত সমাজ-মূল্যবোধের পরিবর্তন-বাঙালি জীবন

মূল প্রবন্ধ :

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট প্রায় দীর্ঘ দু'শো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ভারতবাসীর কাছে ছিল বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নপূরণের মত। কিন্তু এহেন স্বপ্নকে বাস্তবায়িতকরণ খুব সহজে হয়নি। বহু রক্তক্ষয় ও স্বপ্নভঙ্গের সাথে একটি গোটা দেশকে খণ্ডীকরণের ক্ষতি সয়ে ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জন করে। তবে প্রাপ্তির পরে তথাকথিত সেই 'স্বাধীনতা' সকলের ক্ষেত্রে সুখকর হয়নি। বিশেষ করে যে অংশগুলি দেশ খণ্ডীকরণের ফলে নতুন দেশের মর্যাদা লাভ করে সেইসব অংশের মানুষদের কাছে স্বাধীনতা হয়ে ওঠে যেন বিভীষিকা। যে দেশের মাটিতে তারা জন্মেছে এবং লালিত হয়েছে রাতারাতি সেই দেশ তাঁদের কাছে বিদেশে পরিণত হয়। তাছাড়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও ধর্মকে অস্ত্র বানিয়ে যে বীভৎস দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে সাধারণ মানুষের কাছে দুঃস্বপ্নে পরিণত করে। মূলতঃ বাংলা ও পাঞ্জাবে এই দুঃস্বপ্ন তথা দাঙ্গা নারকীয় রূপ লাভ করে। মানবিকতা নামক শব্দটি মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তার সাথে অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারত্বও মানুষের জীবনে প্রবলভাবে দেখা দেয়। পরিবর্তিত হয় সমাজ। পরিবর্তিত হয় ব্যক্তির মূল্যবোধ। যার প্রভাব সাহিত্যেও দেখা যায়।

বিশ্বাস, মাধবী : প্রফুল্ল রায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিবর্তিত সমাজ ও মূল্যবোধের রূপায়ণ
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 2, Dec 2023, Pages : 36-42, ISSN 2249-4332

স্বাধীনতা উত্তরকালে যে সমস্ত কথাসাহিত্যিক দেশ বিভাজন ও তৎপরবর্তীকালের সমাজজীবন নিয়ে লিখেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন প্রফুল্ল রায়। সাংবাদিকতা পেশার সূত্রে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘোরার অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহিত্য রচনার রসদ যুগিয়েছে। বিভিন্ন স্থানের শোষিত, দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের জীবনের যন্ত্রণা তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন। তার সাথে ছিল দেশ বিভাগ ও বাস্তুহারাদের স্বজন হারানোর যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন শুধুমাত্র তাঁর উপন্যাসেই হয়নি তাঁর বেশ কিছু গল্পেও এই অভিজ্ঞতা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাঙালির সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন আসে এবং তার সাথে সাথে ব্যক্তির মূল্যবোধের যে পরিবর্তন হয় তার প্রতিচ্ছবি প্রফুল্ল রায়ের গল্পে কীভাবে ফুটে উঠেছে তাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ের আলোচনার জন্য কয়েকটি নির্বাচিত গল্প হল—'রাজা যায় রাজা আসে', 'একটি শব্দের মানে', 'মাঝি', 'স্বপ্নের ট্রেন', 'মৃত্যুর এপারে এবং ওপারে'।

'মাঝি' গল্পটি ১৯৪৬-৪৭ এর ভয়াবহ দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা। গল্পের প্রধান চরিত্র ফজল। সে ধলেশ্বরী নদীর কেরায়া নৌকার মাঝি। তার জীবনের সব স্বপ্ন সলিমাকে ঘিরে। যাকে নিয়ে সে সুখের সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে। সলিমাও ফজলের সুখস্বপ্নে মগ্ন থাকে। কিন্তু সলিমার বাবা কন্যাপণ হিসেবে পেতে চায় সাত কুড়ি টাকা। তাই সলিমাকে পাওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ফজল দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। অনেক কষ্টে সে ছয় কুড়ি দশ টাকা জমিয়েছে। আর মাত্র দশ টাকা হলেই সলিমাকে তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারবে। সলিমাকে সে কথা দেয়—"আইজের দিনে কেরায়া বাইলেই দশটা ট্যাকা পাইয়া যামু"।[১] সে আরো জানায়—"হেয়ারপর সাত কুড়ি ট্যাকা তোর বাজানের হাতে দিয়া আমার ঘরে নিয়া আহুম তরে"।[২] ভবিষ্যতের সুখনীড়ের স্বপ্ন বোনা এই দুই তরুণ তরুণীর স্বপ্ন বোনার কথা নিয়ে গল্প শুরু হলেও গল্পের প্রেক্ষাপটে দেশভাগ, দেশত্যাগ ও দাঙ্গা ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে। সলিমার সাথে কথোপকথন প্রসঙ্গে ফজল জানিয়েছে হিন্দুদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। সে জানায় সলিমার বাবাকে দেওয়ার জন্য সাত কুড়ি টাকার অবশিষ্ট দশ টাকার সংগ্রহ করা তার পক্ষে কঠিন নয়। কারণ—

> "হিন্দুরা সাত পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে বে-বাজিয়াদের মত চলে যাচ্ছে কলকাতার দিকে। একটা কিরায়া নিলে পাঁচ-দশ টাকা পাওয়া আজকাল আশ্চর্য কিছু না"।[৩]

দাঙ্গা চলাকালীন পরিস্থিতিতে নিজেদের সাত পুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল কিছু মানুষ। যেকোনো উপায়ে দেশ ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ফজলের উক্তিতে সেই চিত্রই ধরা পড়ে। সেদিন কেরায়া বেয়ে ফজল সাত টাকা উপার্জন করে। টাকাগুলিকে সে যকের ধনের মতো আগলে রাখে। ভবিষ্যতের স্বপ্নময় দিনের কথা মনে করে সে গেয়ে ওঠে—

> "কালো চোখের মদ খাইয়াছি
> হইয়াছি উন্মন
> আর মদ খাইয়াছি আমার বঁধুর
> পেরথম যৈবন"।[৪]

গান গাইতে গাইতে তার মনে পড়ে নারকেল বনে সলিমার সাথে দেখা করার কথা। সে যাওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়। ঠিক সেই সময়ে সওয়ারি হয়ে হাজির হয় মালখানগরের ইয়াছিন শিকদার। তার পেছনে থাকা বোরখায় ঢাকা নারী মূর্তিটিকে ফজল ইয়াছিনের বিবিজান বলে অনুমান করে। ফজল নৌকায় সওয়ারি নিয়ে যেতে রাজি না

থাকলেও দশ টাকা পাওয়ার আশায় একসময় সে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু সেই নারী মূর্তিটি নৌকায় উঠতে না চাইলে ফজলের মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। ইয়াছিন মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে নৌকায় তুললে ফজল তাকে জানায় তারা যেন পরের দিন যায় অর্থাৎ সে যেতে রাজি নয়। ফজল ইতস্তত করছে দেখে ইয়াছিন তাকে পনেরো টাকা দিতে চায়। তাতে টাকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করা ফজল সহজেই রাজি হয়ে যায়। নৌকা বাওয়া শুরু করে ফজল আবার সলিমার স্বপ্নে মগ্ন হয়ে যায়। কিন্তু তার সে সুখস্বপ্ন ভেঙে যায় ইয়াছিন ও সেই নারীর কথোপকথনে। ফজল শুনতে পায় সেই নারীটি কান্নাভরা কণ্ঠে বলছে —"আমারে কউলকাতায় দিয়া আহেন। আপনে আমার ধর্মের বাপ; আপনার পায়ে ধরি"।[৫]

তখন চিৎকার করে ইয়াছিন বলে ওঠে—"তর বাজান না লো হুমুন্দির ঝি, আমি তর পোলার (ছেলের) বাজান হইতে চাই। অহন চুপ মাইরা থাক। তরে আনতে গিয়া তর হোয়ামীর তিনটা সড়কির খোচা খাইছি"।[৬]

ইয়াছিন আসলে নারীটির স্বামীকে হত্যা করে তাকে ভোগ করার জন্য তাকে জোর করে চরইসমাইলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। দেশভাগের পরে এই চিত্র নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। তখন হত্যালীলা, নারীর সম্ভ্রম হরণ খুবই সাধারণ বিষয়। ইয়াছিনের নারী অপহরণ তারই নিদর্শন। এরপর একসময়ে নারীটি চিৎকার করে ফজলের সাহায্য প্রার্থনা করে বলে—"আমারে বাঁচাও মাঝি, আমারে বাঁচাও। আমি তাতিবাড়ির বউ। দাঙ্গায় আমার হোয়ামীরে মারছে অরা"।[৭] এক অসহায় নারীর আর্ত চিৎকারে ফজল চুপ থাকতে পারেনি। যেন তার অজান্তেই তার হাতের কোঁচটা সে ছুঁড়ে দেয় ইয়াছিনের দিকে। এভাবেই প্রেমিক ফজল রূপান্তরিত হয় হত্যাকারীতে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দাঙ্গায় হিন্দুরা যখন অত্যাচারিত হয়ে দেশ ছেড়েছে তখন মুসলিমদের প্রতিনিধি হয়েও ফজল যে মানবিকতা নিদর্শন দেখিয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য। অসহায় নারীটিকে ইয়াছিন নামক পাশবিক ধর্মের মানুষের হাত থেকে শুধু রক্ষাই করেনি তাকে কলকাতায় যেতে সাহায্যও করেছে। সলিমাকে পাওয়ার জন্য তিল তিল করে জমানো টাকা তুলে দিয়েছে স্বামী, পরিবার ও সর্বস্বহারা অসহায় নারীর হাতে। এ কাজ করতে গিয়ে সলিমার জন্য তার বুকে মোচড় দিয়েছে এ কথা সত্যি। কিন্তু, দেশ ও কালের এক অসহায় সময়ে দাঁড়িয়েও নিজের মানবিকতা ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে পারেনি মাঝি ফজল। এই কারণেই সে ইয়াছিনকে হত্যা করেছে। নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে এক অসহায় নারীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। গল্পে ফজলের মানবিকতা ও মূল্যবোধ যেন বিশ্ব মানবিকতার নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

প্রফুল্ল রায় এমন একজন লেখক যিনি দেশভাগের কারণে হওয়া হিংসা ও হানাহানির কথাই শুধু বলেননি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির দিকটিও তুলে ধরেছেন। ১৯৪৭ এ ভারতের স্বাধীনতা 'পাকিস্তান' নামক যে মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে সেখানে হিন্দুদের বাস করা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তথাকথিত দেশনায়কদের ভুল সিদ্ধান্তে বিপর্যস্ত হয়েছিল সাধারণের জীবন। ধর্মকে কেন্দ্র করে হিন্দু- মুসলিম দাঙ্গা প্রকৃতপক্ষে মানবতারই অপমান। যে দাঙ্গায় প্রতিহিংসার কারণে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণির মানুষেরাই নির্যাতিত হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে দেখা যায় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অংশের বাঙালি হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এই সুযোগে হিন্দুদের ফেলে যাওয়া বাড়ি-ঘর সম্পত্তি দখল পেয়েছে এক শ্রেণির মুসলমান। দেশভাগ যেন তাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছে। প্রতিটি মুদ্রার যেমন সোজা ও উল্টো দিক আছে ঠিক তেমনই প্রত্যেক ঘটনার ভালো ও খারাপ দুই দিকই আছে। দেশভাগের পরিণতি বেশিরভাগ মানুষের জীবনে যন্ত্রণাদায়ক হলেও বেশ কিছু মানুষের কাছে তা লাভজনক হয়ে ওঠে। যেমন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন এবং দাঙ্গার ফলে দেশ ছেড়ে যাওয়া এক ধনী হিন্দুর সম্পত্তির অধিকার

পেয়ে ভাগ্যাহত যুবক রাজেক মিঞার ভাগ্য ঘোরার কাহিনি 'রাজা যায় রাজা আসে' গল্পটি। যদিও গল্পের শেষে সে পুনরায় সবকিছু হারিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। কিন্তু রাজেকের হঠাৎ প্রভূত সম্পত্তির মালিকানার অংশীদার হতে চাওয়া ধনী তোরাব আলীর রাজেককে সসম্মানে নিজের জামাই করতে চাওয়া এবং শেষে সর্বস্ব খোয়ানো রাজেকের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকার করার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা।

তিরিশ বছরের রাজেক জীবনযুদ্ধে পরাস্ত এক মানুষ। নিজের পেট চালানোর দায়ে সে কখনও পরের জমিতে কামলা খাটে, খালে-বিলে মাছ ধরে, কখনও ধান কাটার পরে পরের জমিতে পড়ে থাকা ধান কুড়িয়ে জীবনধারণ করে। একদিন স্কুল বাড়ির সামনের বড় মাঠটায় বিলেতি বাজনা বাজানো, বক্তৃতা দেওয়া এবং সিল্কের পতাকা ওড়ানো দেখে বিস্মিত হয় সে। পরে অবশ্য জানতে পারে যে সেদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র। রাজেকের মত মানুষ যার জীবনে পেট চালানোই একটা বড় সংগ্রাম তার জীবনে স্বাধীনতা, দেশভাগ সবই মূল্যহীন। এর এক বছর পরে রাজেকের জীবনে আসে আনন্দঘন মুহূর্ত। নব্বই কানি জমি এবং পুকুরের মালিক বৈকুণ্ঠ সাহা তাঁর সর্বস্ব ছেড়ে সপরিবারে কলকাতা যাওয়ার সময়ে রাজেকের ওপর সব ছেড়ে দেন। তিনি জানান যে তাঁরা যদি ফেরেন তাহলে রাজেক যেন সব ফিরিয়ে দেয় না হয় সবকিছু তারই হবে। হঠাৎ ঐশ্বর্যের অধিকারী রাজেকের জীবনধারায় পরিবর্তন আনে। পায়ের হাজা ও নখকুনি সেরে যায়। চামড়ায় মসৃণতা ও চকচকে ভাব আসে। শৌখিন জীবনে অভ্যস্ত হয় সে। এত সুখের মধ্যে রাজেকের মনে হয়—

> "ভাগ্যে দেশখানা দু ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যে বৈকুণ্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল। না হলে তার কপাল কি খুলত! এত সুখের মুখ কি সে দেখতে পেত!"[৮]

এদিকে দুশো কানি তেফসলা জমি, পঞ্চাশ-ষাটটা গোরু, বলদ এবং গোটা চল্লিশ নৌকার মালিক তোরাব আলী নিজে এসে রাজেককে হঠাৎ করেই সসম্মানে নিজের বাড়িতে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে বিস্মিত হয় সে। যার কাছে এতদিন সে ছিল 'রাজেইকা'। 'তুই' বলে সম্বোধন করত সেই মানুষটি তাকে 'রাজেক মিঞা' এবং 'তুমি' বলে সম্বোধন করায় রাজেক হতভম্ব হয়েছে। এরপর অঘ্রাণের এক সকালে তোরাব আলী রাজেকের কাছে তার মেয়ের সাথে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এতবড় ধনীর মেয়েকে বিয়ে করতে সে রাজি না হতে চাইলে তোরাব আলী তাকে জানান—

> "আর বড় মানুষ, বড় ঘরের কথা যখন তুললা তখন কই তুমিও ছোট না, বৈকুণ্ঠ সা'র অত জমিন পাইছ, ঘর-দুয়ার হাল-হালুটি পাইছ। তুমি কম কিসে? জাতে উইঠা গেছ মেঞা"।[৯]

তোরাব আলীর প্রস্তাবে রাজেকের আবার মনে হয় যেন দেশভাগ হওয়া তার জন্য সুখকর হয়েছে। কিন্তু যেদিন তোরাব আলী তার মেয়ের সাথে রাজেকের বিয়ের জন্য রাজেকের বাড়িতে নৌকা পাঠাতে চেয়েছেন সেদিনই বৈকুণ্ঠ সাহা ফিরে আসেন। তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে আমিন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। রাজেককে জানান মুর্শিদাবাদের আমিন সাহেবের সব সম্পত্তির সাথে বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পত্তির বিনিময় হবে। রাজেক মিঞা ভাগ্যের পরিহাস বুঝতে পেরেও তোরাব আলীর পাঠানো নৌকায় চড়ে বিয়ে করতে যায়। কিন্তু সেখানে যাবার পরে তোরাব আলী রাজেকের মনমরা থাকার কারণ জানতে চাইলে রাজেক সত্যিটা বলে দেয়। লোভী তোরাব আলী তখন জানান—"তাইলে শাদির কথার দরকার কী? খোদা যা করে ভালর লেইগাই করে। ভাগ্যি আজই বৈকুণ্ঠ সা আইছে"। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল এবং বড় বড় পা ফেলে ভেতরবাড়ির দিকে চলে গেল।[১০]

হঠাৎ প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারী রাজেককে জাতে তুলে নিয়ে আপ্যায়ন করে জামাই করতে চাওয়ার মধ্যে

তোরাব আলীর স্বার্থপরতা কাজ করেছে। বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি লোভ সংবরণ করতে জানতেন না বলেই রাজেকের সাথে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। দেশভাগের মত এক অস্থির সময়ে নিজের মূল্যবোধকে বর্জন করে বেওয়ারিশ সম্পত্তির মালিকানা নেওয়া সাধারণ ব্যাপার ছিল। রাজেক যদিও বেওয়ারিশ সম্পত্তি দখল করেনি। বৈকুণ্ঠ সাহার নির্দেশেই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। আবার তিনি ফিরে এলে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে সে কোনো বিবাদ করেনি। তোরাব আলীর স্বার্থপরতার বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠেনি। প্রকৃতপক্ষে রাজেকের মত প্রান্তিক মানুষ ছলনা জানে না। তাই সে আপনমনেই বলে দেশখানা দুইভাগ হয়। এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে। তাতে তার কী। যে দেশভাগ তার কাছে একসময় সুখের বলে মনে হয়েছিল তাই তার কাছে অসার বলে মনে হয়েছে।

দেশভাগের ফলে বহু মানুষকে বাস্তুহারা হতে হয়েছিল। পরিবর্তিত হয়েছিল সমাজজীবন। স্বচ্ছল জীবন ছেড়ে বাস্তুহারা হয়ে কলকাতায় বসবাসকারী খুবই সাধারণ পরিবারের গল্প 'স্বপ্নের ট্রেন'। গল্পে বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা অশোক দেশভাগের পরে কলকাতায় চলে এলেও সে স্বপ্নে দেখে যে একটি ট্রেনে চেপে সে তার ফেলে আসা গ্রাম বজ্রযোগিনীতে চলেছে। তার বন্ধুরা রাশেদ, কামাল বা আতিকুলদের এখনও সেই গ্রামেই বাস। তাই স্বপ্নের ট্রেনে চেপেই সে তাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছে। যদিও বাস্তবতা কড়া নাড়ায় তার স্বপ্ন সম্পূর্ণ হয় না। বাবার ডাকে ঘুম থেকে উঠে ছুটতে হয় জীবিকার সন্ধানে। আড়াইশো টাকার মাইনের সামান্য কেরানীর চাকরিতে সাত সাতটি পেট চালানো অশোকের বাবার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তারা এখন কলকাতার শ্বাসরুদ্ধ গলির দেড়খানা ঘরের ভাড়াটে। অথচ একসময় তাদের স্বচ্ছল জীবন ছিল। অশোক তার বাবাকে দেখে ভেবেছে—

> "একদা মুন্সীগঞ্জের বজ্রযোগিনী গ্রামে সাড়ে তিনশ" কানি জমির মালিক ছিল। তখন শখ করে গ্রামের স্কুলে বিনা মাইনেতে হেডমাস্টারি করত বাবা। দেশে থাকতে কী চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল"।[১১]

কেরানিগিরির মাইনেয় পেটা চালানো যেখানে দায় সেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার ভাবনা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। তাই অশোকের বাবা অশোককে কখনও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে, কখনও বড় অফিসার কিংবা এম.এল.এ, এম.পি এর বাড়িতে পাঠান চাকরির জন্য। জীবনযুদ্ধে লড়াই এর সময়ে তার স্বপ্নের ট্রেনটির আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

গল্পের দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় বারো-চোদ্দ বছর পরে ১৯৭১ এর এপ্রিলের শেষে অশোকের স্বপ্নে আবার ট্রেনটি দেখা দেয়। যে স্বপ্নে অশোকের গায়ে যোদ্ধার সাজ—"অনুভব করল চোয়াল শক্ত, চোখেমুখে কঠিন প্রতিজ্ঞা জ্বলছে"।[১২]

বোঝা যায় জীবনযুদ্ধে লড়তে গিয়ে অশোকের অন্তরাত্মা যেন চিৎকার করে উঠতে চায়। দেশভাগের জন্য সর্বস্ব খোয়াতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। রাষ্ট্রনায়কদের সিদ্ধান্তের বলি হয়েছিল তারা। অশোক ও তার পরিবার তাদেরই প্রতিনিধি। অশোকের অন্তরাত্মা এই ঘটনার প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। তাইতো স্বপ্নে তার চোখেমুখে কঠিন প্রতিজ্ঞা। কাহিনির বাস্তব দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যায় গল্পের এই অংশটিতে অশোকের জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মার্চেন্ট অফিসের ক্লার্ক অশোকের বাবা মারা গেছেন। এক ভাই নাসিকে থাকে। আরেক ভাই জেলে। বোনদের মধ্যে একজন পালিয়ে গেছে। তিন-তিনটি বাচ্চা এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসারের নাজেহাল অবস্থা। চায়ের দোকানে পাক জঙ্গীশাহীর হাতে এক লক্ষ লোকের নিহত হওয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়া কিংবা নিরস্ত্র গ্রামবাসীর ওপরে প্লেন থেকে বোমাবর্ষণের খবরের উত্তেজক আলোচনা তার রক্তেও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কিন্তু চাকরি জীবনের চাপ এবং পরিবারের দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধতা তাকে সে সুযোগ দেয় না। আবার কোম্পানি থেকে গড়া রিলিফ ফাণ্ডে কিছু সাহায্য দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সে দিতে পারেনি। এমনকি সীমান্তে

রিলিফ নিয়ে যাওয়ার দলেও সে সামিল হতে পারেনি। গল্পকার উল্লেখ করেছেন—"যৌবনের শুরু থেকে একটা মধ্যবিত্ত লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে আছে অশোক। জীবনের অন্য কোন মহৎ যুদ্ধ তার জন্য নয়"।[১৩] তাই পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে স্বপ্নের ট্রেনটা আসা বন্ধ হয়ে যায়।

সাধারণ মানুষের জীবনে দেশভাগ যেন অভিশাপের আরেক রূপ। অশোকের মত এমন কতশত মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। তাদের জীবনের শান্তির নীড় পরিণত হয়েছে যাঁতাকলে। যেখানে মানুষের মন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায়। সেখানে দেশপ্রেম, সামাজিকতা বা মূল্যবোধ যেন মূল্যহীন।

দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, দাঙ্গা প্রভৃতি সমাজে যে পরিবর্তন এনেছিল তাতে মানুষের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তিত মূল্যবোধের গল্প 'একটি শব্দের মানে'। দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট হওয়া বেকারত্বের কবলে পড়া দুজন যুবক-যুবতীর গল্প এটি। বেকারত্ব ও অভাবের কাছে মূল্যবোধের কোনো দাম নেই, গল্পে যেন তারই ইঙ্গিত রয়েছে। গল্পের কথক ভালো রেজাল্ট সহ গ্র্যাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও দাদার বাড়িতে অবাঞ্ছিতের মত থাকতে হয়। গল্পের নায়িকা জয়তী পূর্ব বাংলার মেয়ে। কিন্তু সে তার মামার বাড়িতে কলকাতায় থাকে। জয়তীর বাবা কিছু কিছু টাকা পাঠালেও মামার বড় সংসারে তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। গ্র্যাজুয়েশনের পরে সেও চাকরি সন্ধানী এক বেকার। শুধুমাত্র টিউশনির ওপর নির্ভর করে একসময় দুজনে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে। সে খবর জয়তীর মামা বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেলে তার মামা তাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেন। দুজনের পরিবারের সমস্যা থাকায় দুজন পরস্পরকে 'অ্যাডজাস্ট' করে নেবার সান্ত্বনা দেয়। একটি ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিসে চাকরির চেষ্টায় যাবার সময় রাস্তায় কথকের সাথে জয়তীর দেখা হয়ে গেলে কথক তাকেও সেখানে নিয়ে যায়। কোম্পানির ম্যানেজার সান্ধু সাহেবের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময়ে জয়তীও সঙ্গে যায়। আলাপ হয় সান্ধু সাহেবের সাথে। এরপর দেখা যায় কথককে বেশ কয়েকদিন ঘোরানোর পরে তিনি জানান চাকরিটা কোনো মেয়ের জন্য। ছেলেকে নেওয়া যাবে না। তখন তিনি নিজেই জয়তীর কথা বলেন এবং জয়তীই চাকরিটা পায়। ভবিষ্যতের স্বপ্নসন্ধানী দুই বিবাহিত যুবক- যুবতী একটু কিনারা পেয়ে এরপর বাড়ি ভাড়া নেয়। দুজনেই পূর্বের কুৎসিত জীবন থেকে মুক্তি পেলেও বেকারত্ব একসময়ে কথকের মনে জয়তীর প্রতি ঈর্ষার সৃষ্টি করে। জয়তীর প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফেরা কথককে বিচলিত করে। এরপর কথক বুঝতে পারেন যে কাজের জায়গায় সান্ধু সাহেবকেও সঙ্গ দিতে হয় জয়তীকে। জয়তীকে সে চাকরি ছেড়ে দিতে বললে সে জানায়—"যত তাড়াতাড়ি পার একটা চাকরি যোগাড় করে নাও। তোমার কিছু হলেই আমি চাকরিটা ছেড়ে দেব"।[১৪] এরপর জয়তী জানায়—"যতদিন চাকরি না পাচ্ছো মনে মনে এই ব্যাপারটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও"।[১৫] কথকের কাছে এই 'অ্যাডজাস্ট' শব্দটাকে দুঃসহ ও নির্মম বলে মনে হয়।

গল্পটিতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে চাকরির জন্য কথক নিজের মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে জয়তীকে ব্যবহার করতে চেয়েছে। সান্ধু সাহেবের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময়ে জয়তীকে নিয়ে যাওয়ার কারণ—"একটি সুন্দরী মেয়ে সামনে বসে থাকলে তার এফেক্ট অন্যরকম"।[১৬]

আবার সান্ধু সাহেবের সামনে জয়তীকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করেছে। কারণ একজন বেকারের স্ত্রী আছে জানলে হয়ত 'ডিসকোয়ালিফিকেসন' হয়ে যাবে। জয়তী বাধ্য হয়েছে সান্ধু সাহেবকে সঙ্গ দিতে, তার গাড়িতে চড়তে। চাকরি চলে গেলে দুজনেই বেকার হয়ে পথে বসতে হবে ভেবেই সে তেমনভাবে 'অ্যাডজাস্ট' করে নিচ্ছিল। তাই কথককেও চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত জয়তীর ব্যাপারটাকে 'অ্যাডজাস্ট' করে নিতে বলে।

বাঙালি সমাজজীবনে দেশভাগের মত অস্থির পরিস্থিতি এবং তৎপরবর্তীকালের হিংসা ও দাঙ্গার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। পরিবর্তন এসেছিল ব্যক্তিজীবনে। প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে এই দেশভাগের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। দেশভাগের কারণ বিবেচনা করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের সমাজ ও জীবনে এর প্রভাব কেমন ছিল তারই চিত্রায়ণ করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে বলেছেন—

"কেবল পরিবর্তমান সমাজের ছবি নয়, পরিবর্তমান মূল্যবোধের পরিচয়ও তাঁর গল্পে পাই"।[১৭]

তাইতো দেখা যায় কখনো ইয়াছিনের মত বর্বর মানুষের লালসার হাত থেকে তাঁতি বাড়ির বউয়ের সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজের মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছে ফজল নামে এক সাধারণ মাঝি। কখনো রাজেক নামের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে বা সংসারের যাঁতাকলে পড়ে নিজের মূল্যবোধকে গলা টিপে হত্যা করে অশোকের মত এক যুবক। পরিস্থিতির চাপে পড়ে নিজের মূল্যবোধের বিসর্জন দিতে হয় জয়তীর মত এক সাধারণ মেয়েকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তিত সমাজ ও মূল্যবোধেরই প্রতিফলন প্রফুল্ল রায়ের গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে।

তথ্যসূত্র :

১. প্রফুল্ল রায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৮৩, পৃষ্ঠা নং- ১১৮।
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১১৮।
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১১৯।
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১২১।
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১২৫।
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১২৫।
৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১২৭।
৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ৩৬।
৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ৪০।
১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ৪৪।
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১৫২।
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১৫৪।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১৫৮।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১১৬।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১১৬।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১১১।
১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৬, পৃষ্ঠা নং -৪৯৮।

মাধবী বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।

মহেশপুরের শোলাশিল্প : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক আলোচনা

পৌলোমী রায়

ভূমিকা

বর্তমানকালের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলার লোকশিল্পগুলির আলোচনা-সমালোচনার শুরু হয়েছে। এগুলির নব মূল্যায়ন, গবেষণা, সমস্যাবলী ও সমাধান প্রক্রিয়াতেও এসেছে নতুন জোয়ার। প্রতিমুহূর্তে আধুনিক হতে থাকা আমাদের এই সভ্যতা যেভাবে তার প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে চলেছে তা বাস্তবিকই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সব সময় সব যুগেই বর্তমান এবং সেই শুভবুদ্ধি তথা সচেতনতা নিয়েই পুনরায় শুরু হয়েছে নিজের সংস্কৃতিকে চেনার এবং সকলের কাছে তাকে আবার নতুন করে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়াটির অংশ রূপেই আমার এই ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক গবেষণা। আমার বিষয় মহেশপুরের শোলাশিল্প।

মহেশপুরের ইতিহাস

সম্ভবত পৌরাণিক যুগে পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয় নিধন করছিলেন পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয়রা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। পৌণ্ড্র অর্থাৎ গর্ত বা গহ্বর। তাই যে সকল ক্ষত্রিয়রা পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন তাদেরকে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় বলা হয়। সম্ভবত কোন এক পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় গঙ্গাতীরে পাহাড়ের গহ্বরে প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, (তবে পাহাড় বলতে টিলাকেই এখানে অনুমান করা হচ্ছে)। অনুমেয় যে ইনিই মহেশপুরের গ্রামের হালদার বংশের আদি পুরুষ। মহেশপুরের ইতিহাস এখানকার একসময়ের জমিদার হালদার বংশের ইতিহাসের সমার্থক বললে ভুল হবে না। মহেশপুরের জমিদার হালদাররা তিন ভাই ছিলেন বড় গোবিন্দচন্দ্র, মেজ বৃন্দাবনচন্দ্র ও ছোট রনরঘুনাথ। এখন পর্যন্ত এনারাই বড়-মেজ-ছোট হালদার পরিবার বলে পরিচিত হয়ে আছেন।

আনুমানিক ইংরেজি ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে ছোট হালদার পরিবারের শ্রদ্ধেয় ভীমচন্দ্র হালদার মহাশয় তাঁর বাড়িতে প্রথম শোলার কাজ শুরু করেন। বর্তমানে এই গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে শোলার কাজ হয়। শোলার চাঁদমালা, টোপর, চাঁদোয়া, ফুল, ফল, গাছ, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন কোম্পানি মহেশপুর থেকে তা কিনে নিয়ে গিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করে এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

শোলাশিল্পে ব্যবহৃত উপাদান

শোলা একেবারেই প্রাকৃতিক উপাদান, জলজ উদ্ভিদ। থার্মোকল যেখানে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা নির্মিত সেখানেই শোলা পরিবেশ জাত এবং প্রকৃতি-বান্ধব উপাদান। শিল্পীদের কাছ থেকে বারে বারে এই তথ্য উঠে এসেছে যে, এই শিল্পকর্মে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা এমনকি শিশুরাও যুক্ত থাকে কিন্তু শোলাশিল্পে ব্যবহৃত উপাদান এতটাই নিরাপদ যে সেখানে কোনরকম শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আসলে প্রকৃত লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য এটা। প্রকৃতি তথা

রায়, পৌলোমী : মহেশপুরের শোলাশিল্প : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক আলোচনা
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 2, Dec 2023, Pages : 43-47, ISSN 2249-4332

লোক-সমাজের পরিচিত পরিবেশ থেকেই এরা উপাদান সংগ্রহ করে এবং তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে সেই উপাদানগুলিকে শিল্পের রূপ দেয়।

কাঁচা শোলা

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র বাংলাদেশের দুই প্রকারের শোলা গাছ জন্মায়—কাঠ শোলা এবং ভাতশালা বা ফুলশোলা। ভাত শোলাই হল শোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট উপাদান। একটা সময় ছিল যখন এই নদীমাতৃক বাংলায় প্রচুর পরিমাণে শোলা গাছের জন্ম হত এবং এটি যেহেতু জলজ উদ্ভিদ তাই আলাদা করে কোন যত্নের প্রয়োজন হতো না। প্রকৃতির কারণেই এই উদ্ভিদের বাংলায় প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে ক্রমাগত কমতে থাকা জলভাগ এই শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। জলাভূমির অভাব শোলার উৎপাদনকে অনেকটাই কমিয়ে এনেছে, ফলে শোলা-শিল্পীদের অধিকাংশকেই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বিচ্ছিন্নভাবে শোলা শিল্পীরা যেমন শোলা কিনে নেন ঠিক তেমনি আবার কলকাতার উল্টোডাঙার শোলা হাট থেকেও অনেকে শোলা সংগ্রহ করেন। তবে মথুরাপুর অবশ্যই এই বিষয়ে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিতে পারে। প্রাথমিকভাবে বনগাঁ অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলের শোলার শিল্পীদের উপাদান সংগৃহীত হত। সেক্ষেত্রে কাঁচামালের দাম গাছ প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অঞ্চলের মানুষেরা নিজেরাই তাদের জলাভূমিতে শোলা গাছের চাষ আরম্ভ করেছেন। যার ফলস্বরূপ তাদের কাঁচামাল সহজলভ্য হয়েছে এবং কাঁচামালের দাম কমে গেছে। বর্তমানে গাছ প্রতি এদের খরচ হয় ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা, যা নিঃসন্দেহে তাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করেছে।

কাৎ

নির্মাণ পদ্ধতি

শোলা যেহেতু জলজ উদ্ভিদ, তাই প্রথমেই এই গাছকে জলাজমি থেকে সংগ্রহ করতে হয় এবং তারপর রোদে শুকোতে হয়। কাঁচা অবস্থায় শোলা গাছের যে ছাল তা সবুজ রঙের হয় এবং রোদে শুকানোর পর তার রং হয় গাঢ় বাদামি। এরপর চলে ছাল ছাড়ানোর পালা।

প্রথমে শুকনো শোলা গাছের কাণ্ডটির উপরে বাদামি ছালটি ছাড়িয়ে ভিতরের কার্যোপযোগী অংশ বার করে নিতে হয়। লোকশিল্পের সঙ্গে লোকপ্রযুক্তি যে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তা শোলার শিল্পের এই প্রাথমিক স্তর থেকেই বোঝা যায়। কার্যোপযোগী সাদা অংশটি বার করতে শোলার শিল্পীরা সাহায্য নেন ধারালো ছুরির, এটিকে 'কাৎ' বলে।

এরপর শোলার সেই লম্বা ডালটিকে ছোট ছোট অংশে কেটে নেওয়া হয়। বেলনাকার শোলার টুকরো থেকে কাগজের মত পাতলা যে চাদর কেটে বের করা হয় তার নাম 'কাপ'। কাপের ব্যবহার শোলাশিল্পের সর্বত্র। শোলার এই পাতলা চাদরকে উপযুক্ত আকারে কেটে তাতে নানান রকম কারুকার্য করেন শিল্পী।

তবে একজন প্রধান শিল্পী থাকেন এবং অন্যান্যরা থাকেন তার সহকারী। আমার দেখা মথুরাপুর ব্লকের অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে যেখানে প্রায় প্রতিটি ঘরেই শোলা শিল্প গড়ে উঠেছে, সেখানে আমি দেখেছি—প্রথমে একজন শিল্পী, মানে প্রধান শিল্পী তিনি এই শোলার ডাল থেকে বের হয়ে আসা চাদর অর্থাৎ কাপ অংশকে একের পর এক সাজিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে নেন। এরপরে ওই সুতো দিয়ে বাঁধা এক গোছা পরতে পরতে রাখা ওই কাপগুলিকে তারা নির্দিষ্ট ছুরির সাহায্যে বিভিন্ন আকৃতিতে কেটে নেন। কখনো তা ফুলের পাপড়ির আকৃতি হয়, কখনো আবার তা পাখির

আকৃতি হয়, কখনো আবার সেখান থেকেই সরু সরু অংশ বের হয় যা দিয়ে শিল্পীরা পরবর্তীকালে নানান রকম কল্কার নকশা তৈরি করেন।

সাদা শোলা

এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ্য যে, শোলা শিল্পে শোলা গাছের প্রায় প্রতিটি অংশই ব্যবহার হয়। যেমন—শোলা গাছের বাদামি রং এর ছাল একটি ফুলের মধ্যের অংশ হিসেবে শিল্পী যখন ব্যবহার করেন তখন পাপড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন ওই ছাল ছাড়ানো সাদা অংশটিকে। অর্থাৎ শিল্পী নিজের খেয়ালেই সমস্ত গাছটির বিভিন্ন অংশকে তার শিল্পের জন্য ব্যবহার করেন।

শোলার কাজ করতে গেলে আঠার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী যদিও বর্তমানে ফেভিকল ধরনের আঠার ব্যবহার অনেক বেশি কিন্তু লোক প্রযুক্তির সাহায্যে এনারা নিজেরাই আঠা প্রস্তুত করে নেন। তেঁতুলের বিচি ভেজে নিয়ে তা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। নরম হয়ে গেলে ওই বিচিগুলোর খোসা ছাড়িয়ে বেটে নিয়ে আবার জলে ফেলে ফোটানো হয়। ভালোভাবে ফুটলেই আঠা তৈরি হয় তবে গমের আটা বা ময়দা জলে গুলে তাতে তুঁতে মিশিয়ে জ্বাল দিয়েও আঠা প্রস্তুত হয়। যাতে পোকা না লাগে তাই তুঁতে মেশানো হয় কিন্তু এই আঠাতে তুঁতে ব্যবহারের ফলে নীলাভ রং হয়। তাই শোলার অনেক সূক্ষ্ম কাজগুলি সম্ভব হয় না তাই চিরাচরিত তেঁতুল বিচির আঠাই বেশি ব্যবহৃত হয়। সূক্ষ্ম কাজে যখন আঠার প্রয়োজন হয় তখন সরুর কাঠি সাহায্যে আঠার ব্যবহার হয়। তবে বর্তমানে ফেভিকলও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে।

শোলা দ্বারা নির্মিত শিল্প

বর্তমানে শোলার কাজে সাদার পরিবর্তে রঙের ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে। তবে সেক্ষেত্রে গুড়ো রং ব্যবহার করা হচ্ছে তবে অনেক ক্ষেত্রে এশিয়ান পেইন্টস-এর রংও ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে দুটো ক্ষেত্রেই বড় কোন পাত্রের মধ্যে রং গুলে শোলার তৈরি জিনিসগুলো তাতে চুবিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। বর্তমানে ডাই ফ্লাওয়ার এর ব্যবসা যেহেতু প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃতি পেয়েছে তাই সে ক্ষেত্রে শোলার কাজে রঙের ব্যবহারও বেড়েছে।

শোলা দ্বারা নির্মিত দ্রব্য

আগেকার দিনে প্রাচীন নানান ধরনের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই শোলার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। শোলার নির্মিত টোপর, মুকুট, চাঁদমালা, কদম ফুল, সহ বিভিন্ন লতাপাতার নকশা প্রভৃতির কাজ নিয়েই শোলাশিল্পীরা তাদের নির্দিষ্ট একটা জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন।

শোলা দ্বারা নির্মিত তোরণ

শোলার চাঁদমালা ও কদমফুল প্রতিমা সাজাতে এবং পূজা অর্চনায় যেমন লাগে তার থেকেও বেশি লাগে ১লা বৈশাখ বা অক্ষয় তৃতীয়ার মত সামাজিক উৎসবগুলোতে। নববর্ষের শুভলগ্নের

প্রাক্কালে দোকানে চাঁদমালা আর কদম ফুলের সজ্জা লক্ষ্য করা যায় এই বস্তু দুটোর ব্যবহার বাঙালিয়ানার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

তবে বর্তমানে যে প্রবণতাটা অধিক পরিমাণে আমার চোখে পড়েছে তা হল নানান ধরনের গৃহসজ্জার উপকরণ বিশেষত ডাই ফ্লাওয়ার আর্ট যা একান্ত ভাবে শোলার দ্বারাই নির্মিত হয় এবং যার চাহিদা প্রায় বিশ্বব্যাপী।

মথুরাপুর ব্লকের অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে প্রায় প্রতিটি ঘর শোলাশিল্পের কারখানায় পরিণত হয়েছে। যেখানে ঐতিহ্যবাহী কদমফুল টোপর কিছু নকশা এই সমস্তর সঙ্গে সঙ্গে বা বলা যেতে পারে তার থেকে আরও বেশি করে এই কৃত্রিম ফুলের নির্মাণ চলছে। এছাড়াও ময়ূরপঙ্খী নৌকা, দুর্গা প্রতিমা, পাখি, হাতি, হনুমান, কাকাতুয়া, অসংখ্য সামগ্রী যা আধুনিক কালের নান্দনিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এক্ষেত্রে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে শোলার দ্বারা নির্মিত কৃত্রিম ফুল যেগুলি ডাই ফ্লাওয়ার আর্ট নামে পরিচিত তা সারা বিশ্বে বিখ্যাত ও যেহেতু এগুলো ভেষজ এবং এর কোন ক্ষতিকারক দিক নেই তাই বিশ্বের বাজারে এর চাহিদাও যথেষ্ট তুঙ্গে। তবে শোলার শিল্পীরা এই শিল্পটিকে আরো বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে শোলার সাথে অন্যান্য বেশ কিছু উপাদানও বর্তমানে মিশিয়ে চলেছেন। এই মিশেল তাদের শিল্পকে একটি অন্যরকম রূপ দিচ্ছে। শোলাগাছের সঙ্গে তারা অন্যান্য ভেষজ উপাদানও ব্যবহার করছে গৃহসজ্জা উপকরণ রূপে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—পদ্মফুলের বীজ, খেজুর গাছের ঝাড়ি, বাদামের খোলা, ধুধুল প্রভৃতি।

সর্বক্ষণের সঙ্গী প্রভাকরবাবু

অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এই শিল্পের ভবিষ্যৎ

লোকশিল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকট সবসময় একটা বিরাট অন্তরায়, যা অধিকাংশ লোকশিল্পীকে তাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যশালী পেশা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। কিন্তু মথুরাপুর ব্লকের মহেশপুর গ্রামের প্রতিটি ঘরে শোলার শিল্পের কারখানা অন্য কথা বলে। অন্যান্য লোকশিল্প যেখানে মানুষের পরিবর্তিত রুচি চাহিদার সাথে পাল্লা দিতে হয় বিবর্তিত হয়ে গেছে নয় মুমূর্ষু হয়ে গেছে সেখানে দাঁড়িয়ে বাংলার শোলাশিল্প দিন দিন আরো ফুলে-ফেঁপে উঠছে। এই উন্নতির প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী এই শিল্পের চাহিদা, এর নান্দনিক সৌন্দর্য এবং শিল্পীদের বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা।

মহেশপুর গ্রাম থেকে আমি জানতে পেরেছি যে এই অঞ্চলের গ্রামীণ পরিবারগুলি বংশ পরম্পরায় এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শুধু তাই নয় এদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য পেশা ছেড়ে এই এই শিল্পকেই পেশা রূপে বেছে নিয়েছেন।

সাধারণত বিদেশ থেকে বা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিভিন্ন কোম্পানি বা ব্যক্তির মাধ্যমে এই শিল্পীদের কাছে নানান রকম অর্ডার এসে পৌঁছায়। মূলত ডাই ফ্লাওয়ার এর অর্ডারটাই এই শিল্পীদের কাছে বেশি পরিমাণে আসে এবং সেই সময় তারা তাদের কাজের বা তাদের তৈরি জিনিসপত্রের বিভিন্ন নমুনা যিনি অর্ডার দিচ্ছেন তার কাছে পৌঁছে দেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই একজন মধ্যসত্ত্বভোগী থাকে। পাঠানো নমুনার মধ্যে থেকে পছন্দ করা ফুল বা অন্যান্য যেকোনো সামগ্রী নির্বাচিত হওয়ার পর আসল অর্ডার আসে এবং সে ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার কখনো

কখনো দু লাখ তিন লাখ জিনিসের অর্ডারও আসে।

ফুল প্রতি শিল্পীরা ৫ টাকা করে মজুরি ধার্য করেন এবং তারপর যতগুলি অর্ডার থাকে তার গুণিতক হিসেবে তারা সেই পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা মানতেই হবে মধ্যসত্ত্বভোগীরা তাদের লাভের অনেকটাই খেয়ে ফেলে।

তবে আশার কথা বংশপরম্পরায় এই শিল্পকে পেশা রূপে গ্রহণ করলেও পুরনো দিনের মতো আজ আর শিল্পীরা নিরক্ষর নন তারা অনেকেই স্কুল পাস করেছেন, কলেজ পাস করেছেন অথচ এই পেশার সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছেন সুন্দর ভবিষ্যতের আশায়। এরা অনেকেই ইন্টারনেটের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছেন এবং তাদের ব্যবসার বৃদ্ধি করছেন। ফলে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, অন্যান্য লোকশিল্পের তুলনায় শোলাশিল্প বিবর্তিত কালের সাথে যুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সক্ষম হয়েছে এবং উত্তরোত্তর এর চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

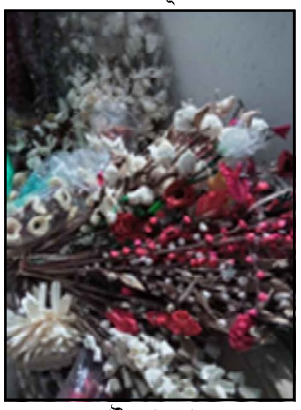

ডাই ফ্লাওয়ার

তথ্যসূত্র

১. সেলিমুদ্দিন শেখ, 'শোলাশিল্প', বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, লোকজশিল্প, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

২. 'মহেশপুরের ইতিবৃত্ত', প্রভাকর হালদার, মহেশপুর সংবাদ, দোলপূর্ণিমা সংখ্যা, মহেশপুর, মার্চ ২০১৬।

৩. ক্ষেত্রবন্ধু, প্রভাকর হালদার।

৪. ক্ষেত্রসমীক্ষায় সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গ - অসীম মণ্ডল, নবীন হালদার, স্বপন হালদার।

পৌলোমী রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, নদিয়া।

পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া নারী সমাজ : একটি সমীক্ষা

দীপাঞ্জন দে

সারাংশ : পটচিত্র ও পটুয়া সম্প্রদায়ের কথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। মূলত লোকশিল্পী হিসেবে পরিচিত পটুয়া বা পটীদাররা ভারতের প্রাচীন জনজাতি। তাঁদের জন্ম কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বিধৃত হয়েছে। পটুয়া সম্প্রদায়ের আদিম পেশা পট আঁকা। পটুয়া শিল্পীদের তুলির টানে, রঙের ব্যবহারে ভারতীয় চিত্রকল্পের আদিম লক্ষণ প্রতিভাত হয়। এহেন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী সমাজের পুরুষ অংশের কথাই যেন বারংবার আলোচনাক্রমে উঠে এসেছে। পটুয়া সমাজের অন্তঃপুরবাসিনীরা যেন আড়ালেই থেকে গেছেন। যদিও পটুয়া পরিবারের মহিলারা পট আঁকা, পটের গান গাওয়া, ভেষজ রঙ প্রস্তুত করা প্রভৃতি কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কিন্তু তবুও পটুয়া নারীসমাজ প্রসঙ্গনির্ভর আলোচনা খুব কমই হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পটুয়া মহিলাদের শিল্পচর্চা ও জীবনচর্যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অবলোকন করতে পারা যায়। এই নিবন্ধে বাংলার পটুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা এবং তাঁদের শৈল্পিক দক্ষতার অনুসন্ধায়ক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

মূল প্রবন্ধ : পটুয়া সম্প্রদায় হলো বাংলা তথা ভারতবর্ষের আদিম চিত্রকর সমাজের একটি অংশ। পটুয়াদের শিল্পসত্তা বা জাতিসত্তা নিয়ে আলোচনা ব্যতিরেকে পটুয়া নারীদের প্রসঙ্গে সরাসরি আসা যাক। বিভিন্ন তথ্যরাশি ও ক্ষেত্রানুসন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের সম্পর্কে একাধিক বিষয় অবলোকিত হয়। এদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরতে পরতে রয়েছে রোমাঞ্চিত ও বহু বিবর্তিত একাধিক বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিত্যনতুন বহু তথ্যের হদিস পাওয়া যায়। সেগুলি যথাবিহিত এই গবেষণা নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের ওপর অনুসন্ধান চালিয়ে একটি বিষয় স্পষ্টত বোঝা যায় যে, ক্রমান্বয়ে তারা তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পকলা ও পিতৃপুরুষের জীবিকা থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের যে কয়েকটি জেলায় পটুয়াদের বসতি রয়েছে সেখানে আবার তাদের মধ্যে জেলাভিত্তিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়াদের সাথে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের পটুয়াদের বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য চোখে পড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়ারা অনেকাংশেই তাদের পিতৃপুরুষের ধারণ করা জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আবার মুর্শিদাবাদের পটুয়া নারীরা গৃহস্থালির কাজ ও অন্যান্য শিল্পের সাথে যতটা যুক্ত, পটশিল্পের সাথে ততটা নন। বর্তমানে এই জেলার দু-একটি পটুয়া পরিবার পটশিল্পের সাথে যুক্ত। কিন্তু আবার পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পটুয়া চিত্রকরদের ক্ষেত্রে এমনটি বলা যাবে না। এই দুই জেলার পটুয়া নারীদের পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে পট আঁকতে দেখা যায়। সেখানকার পটুয়া নারীরা জড়ানো পট বা দীঘল পটের গানও জানেন।[১] এই তারতম্যের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করা ও পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া নারীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যথাযথ খোঁজ করাই এই গবেষণা নিবন্ধের মূল বিষয়।

দে, দীপাঞ্জন : পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া নারী সমাজ : একটি সমীক্ষা
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 2, Dec 2023, Pages : 48-54, ISSN 2249-4332

পশ্চিমবঙ্গের যে কয়েকটি জেলায় পটুয়া সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে, তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা হলো অন্যতম। মুর্শিদাবাদ জেলায় পট দেখিয়ে, পটের গান শুনিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা পুরুষ পটুয়া শিল্পীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য।[২] আর এই জেলায় পটুয়া পরিবারের মহিলাদের পট নিয়ে ভিক্ষা করতে বের হওয়ার দৃষ্টান্ত তো নেইই। যেখানে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মহিলা পটুয়ারা পটচিত্র আঁকার পাশাপাশি 'পট খেলা'তেও জানেন।[৩] এই দুই জেলার দু-একজন মহিলা পটুয়া জড়ানো পট প্রদর্শন করে পটের গান শুনিয়ে ভিক্ষা করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ পটুয়া নারী পটের গান একেবারে জানেন না, অথবা যেটুকু জানেন, তা না জানারই সামিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ পটুয়ার স্মৃতি থেকে পটের গান মুছে গেছে। পুরুষ পটুয়া শিল্পীরা কেউ কেউ পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে পটের গান কিছুটা মনে রাখলেও, পটুয়া মহিলারা তা একেবারেই মনে রাখেননি। মুর্শিদাবাদ জেলার আমলাই গ্রামের কণিকা পটুয়া, গোকর্ণের ববি পটুয়া, আও গ্রামের অনিতা পটুয়ার মতো পটুয়া পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়।[৪]

যুগের পরিবর্তনে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া সম্প্রদায় এবং তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত পটশিল্প যথেষ্ট সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাঁদের শৈল্পিক দক্ষতার ক্রমবিবর্তন দেখে সেটা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। কালের নিরিখে পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৭০ সালে D.J. MacCutchion এই প্রবণতার কথা লিখেছিলেন।[৫] একবিংশ শতাব্দীতে বাংলার এই প্রাচীন লোকশিল্পীরা নতুন করে জেগে উঠেছে। অন্ততপক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরের চিত্রকর পটুয়াদের ক্ষেত্রে একথাটি অবশ্যই প্রযোজ্য। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়াদের প্রসঙ্গে এরকম কোনো মন্তব্য করা যায় না। বরং মুর্শিদাবাদের পটশিল্প ও পটুয়াদের অবস্থা দিনে দিনে হতশ্রী হয়েছে। যেখানে অন্যান্য জেলার পটশিল্প আবার চর্চার মধ্যে এসেছে, সেখানে মুর্শিদাবাদের পটশিল্প মৃতপ্রায়। এখানে কোনও নতুন বিষয়কে কেন্দ্র করে পট আঁকা হচ্ছে না। পুরাতন পটগুলিও চর্চার অভাবে হারিয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের এখনকার পটুয়া শিল্পীরা নির্দিষ্ট কয়েকটি পটই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঁকছেন। যেখানে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পটুয়া শিল্পীরা নিত্যনতুন বিষয়কে কেন্দ্র করে পটচিত্র আঁকছেন। এর কারণ বহুমুখী। ক্ষেত্রসমীক্ষায় যা প্রত্যক্ষ করা গেছে তা হলো, এই জেলার পটুয়াদের কাছে সরকারি সাহায্য তেমনভাবে এসে পৌঁছায়নি। পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরের পটুয়ারা যেমন কিছু সরকারি সাহায্য পেয়েছেন এবং বর্তমানেও পাচ্ছেন। সেখানকার পটশিল্প আবার পুনরুজ্জীবন পেয়েছে। বংশপরম্পরায় পটুয়ারা আবার পট আঁকছেন, পটের গান গাইছেন। মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা এই ধরনের সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বেশি করে সরকারি সাহায্য পেলে মুর্শিদাবাদ জেলার পটশিল্পও পুনরায় জেগে উঠতে পারে বলে মনে করাই যায়। আর তার সাথে সাথে স্বাভাবিক নিয়মে পটুয়া পরিবারের নারীদেরও অবস্থার উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

আসলে মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়া ও তাদের পটশিল্প নিয়ে গবেষক মহলে যতটা চর্চা হওয়ার দরকার ছিল ততোটা হয়নি। অনেকে জানেনই না যে মুর্শিদাবাদেও পটুয়ারা রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। অন্যান্য জেলার পটুয়া ও তাদের পটশিল্প তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি চর্চিত। এর আরেকটি কারণ হলো সেখানকার পটুয়া বসতি। বিশেষ করে দুই মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার মুর্শিদাবাদের থেকে পটুয়া বসতি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের পটুয়া বসতি খুবই কম। আবার তার মধ্যে অনেক পটুয়া কাজের জন্য এই জেলা ছেড়ে অন্য জেলায় চলে গেছে। সেখানেই বসতি গড়েছে, আর ফেরেনি। অনেক নামকরা পটুয়া শিল্পী মুর্শিদাবাদে জন্মেছেন। কিন্তু পরে তারা তাদের শিল্প নিয়ে অন্য জেলায় চলে

গেছেন। বিশেষ করে বীরভূম জেলায় মুর্শিদাবাদের অনেক শিল্পী চলে গেছেন। সেখানে গিয়ে তারা পটশিল্পী হিসেবে নাম করেছেন। যারা ভালো শিল্পী তারা এইভাবে মুর্শিদাবাদ জেলা ছেড়ে চলে যাওয়ায় এই জেলার পটশিল্প সংকটে পড়েছে এবং পটুয়া বসতি কমে গেছে। সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সাহায্য, পটচিত্র ও পটের গানের ওয়ার্কশপ প্রভৃতির মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের পটুয়া সম্প্রদায়কে আবার তাদের পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যমণ্ডিত জীবিকার্জনে অগ্রবর্তী করা সম্ভব বলে মনে হয়।

রোজনামচার জীবনযাপনে পটুয়া নারীরা শাস্ত্রীয় বিধানকে অনায়াসে অস্বীকার করেছেন। শিল্পের ব্যাকরণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পটুয়ারা প্রাচীনকাল থেকে পটচিত্র বা পুঁথিচিত্র অঙ্কন করে গেছেন। তাই শুধু পটুয়া পুরুষদের নয়, পটুয়া নারীদেরও সমাজ বিদ্রোহী বলতে হয়। বর্তমানে পটুয়া নারীরা কোন ধর্ম মেনে চলেন?—এই প্রশ্ন বেশিরভাগ পটুয়াকে অস্বস্তিতে ফেলে। আবার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, হিন্দু গ্রামের পটুয়ারা নিজেদের হিন্দু পরিচয় দেন এবং মুসলিম গ্রামের পটুয়ারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দেন। মুর্শিদাবাদের আও গ্রামের চারকড়ি পটুয়া যেমন বলেন, ''আমরা সব মেনে চলি।''[৬] পটুয়াদের ধর্মজীবন নিয়ে বিশদে জানতে চাইলে তাঁর (চারকড়ি পটুয়ার) অগ্রজ ও অনুজদের কণ্ঠেও একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু এই সব মেনে চলা-র মাত্রা কতটা, বা সকল পটুয়ারাই কি একই মাত্রাতে সব মেনে চলেন, নাকি মাত্রার পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ কোন ধর্মের আচার-আচরণ কতটা মানেন। প্রশ্ন করা যায় বাস্তবে 'সব মেনে চলা'টা কি আদৌ সম্ভব? নাকি এই 'সব মেনে চলা' কথাটির মাধ্যমে তারা 'সব না মানা'ই বোঝাতে চায়। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যখন তাদের ধর্মীয় জীবনচর্যাকে প্রত্যক্ষ গোচরে আনা হয়। কিন্তু সেখানেও রয়েছে রহস্যময়তা।

পটুয়া সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় জীবনচর্যাকে আড়াল করতে চান। তাদের নিজস্ব ভাষা এক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নেয়। বস্তুত, পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু মুসলিম এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে। তাদের জীবনচর্যায় এই সমন্বয়কারী বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয়। এই ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। তাই এই সমন্বয় সাধনের বিষয়টি যেন সবটাই সহজাত। একজন পটুয়া সন্তান ছোটবেলা থেকেই তাদের সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যগুলি পেয়ে যায়। ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনজাতি পটুয়ারা এভাবেই তাদের স্বতন্ত্রতা ধরে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব পটুয়াই তাদের পালনীয় ধর্মীয় আচার আচরণ প্রসঙ্গে বলে থাকেন যে, তারা সবকিছুই মানতে পারেন। এই বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট অনুভূত হয় যে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া সম্প্রদায় ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের দিক থেকে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। এমন পটুয়া নারী দেখা যেতেই পারে, যিনি একই সাথে রোজা রাখেন এবং মাথায় সিঁদুর পরেন। ক্ষেত্রসমীক্ষা চালাতে গিয়ে মুসলিম পটুয়া যেমন দেখা যাবে, তেমনি হিন্দু পটুয়ারও দেখা মিলবে। কিন্তু হিন্দু বা মুসলিম যাই হোক না কেন, তাদের জীবনচর্যায় উভয় ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। আর পটুয়া পরিবারের নারীর জীবনচর্যা লক্ষ্য করলে এটি সবথেকে ভালো বোঝা যায়।

আবার মুর্শিদাবাদের পটুয়া পাড়ায় বা বেদিয়াদের গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে সম্প্রতি তাদের মধ্যে একটা প্রবণতা বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা গেছে। সেটা হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ সদ্য খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ আবার যেন তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে মুর্শিদাবাদের আও গ্রামের পটুয়াদের কথা বলা যায়। এই গ্রামটিতে বর্তমানে প্রায় ১৬-১৭ ঘর পটুয়া রয়েছে।[৭] এই গ্রামের পটুয়ারা ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে মুসলিম। যদিও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রান্তের পটুয়াদের ন্যায় অনেক ইসলামিক আদবকায়দাই তারা এড়িয়ে যান এবং বিশেষত সেখানকার পটুয়া নারীদের একাধিক হিন্দু

রীতিনীতি মানতে দেখা যায়। আসলে পটুয়াদের ধর্মীয় জীবন ধোঁয়াশাময়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ধারণ করা ধর্ম ও যাপন করা ধর্ম পরিচয়ের মধ্যে অমিল রয়েছে।

পটচিত্র আঁকার ক্ষেত্রে পটুয়া পরিবারের নারীদের বিশেষ অংশগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়।[৮] মূলত প্রাকৃতিক উপাদান থেকে রং সংগ্রহ করে এদের যে অঙ্কন পদ্ধতি তাতে পটুয়া পরিবারের নারীরা বিশেষ ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য, আগে বাংলার চিত্রকর পটুয়া সম্প্রদায় ঘরোয়া পদ্ধতিতে পটের রং, তুলি, কাগজ প্রভৃতি সব সরঞ্জাম তৈরি করত। আর ঘরোয়া পদ্ধতিতে পটের সরঞ্জাম তৈরি থেকে শুরু করে পট লেখা (সাধারণত পূর্বে পট আঁকাকে 'পট লেখা' বলা হত, এখনও কেউ কেউ বলে থাকেন) পর্যন্ত পরিবারের মহিলা মহলের বিশেষ অংশগ্রহণ থাকত। বর্তমান কালে আর সর্বতো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারা পট তৈরি না করলেও, সময় বিশেষে তারা ঘরোয়া পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক উপাদান থেকে রং প্রস্তুত করে। আর সমকালেও ভেষজ রং প্রস্তুতে পটুয়া মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান থেকে পটুয়া মহিলারা পটচিত্র তৈরির রং প্রস্তুত করে সম্বছরের জন্য রেখে দেয়। যেন হিঞ্চে শাক ও সিম পাতা থেকে সবুজ রং, পুঁই মেটুলি থেকে বেগুনি রং, কাঁচা হলুদ থেকে হলুদ রং, ভুসোকালি থেকে কালো রং, আতপচাল থেকে সাদা রং, পান ও খয়ের থেকে কালচে লাল রং ইত্যাদি। ঘরোয়া এইসব রং প্রস্তুতে পটুয়া মহিলাদের বেলের আঠা ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত নারকেল মালাতে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে ঘরোয়া রং প্রস্তুত হয় এবং সেই নির্দিষ্ট নারকেল মালাতেই ঐ রং সংরক্ষিত হয়।[৯] আর এই পুরো প্রক্রিয়াটিই মূলত পটুয়া পরিবারের নারীদের নেতৃত্বে হয়ে থাকে।

পটুয়া নারীদের সাথে কথা বলার সময় তাদের বক্তব্যে অনেক সময় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এর পেছনে যে যথেষ্ট বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে, তাও অনুভব করা যায়। তাঁদের নৃতাত্ত্বিক বিবর্তন অধ্যায়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করলে এবং উভয়কে পাশাপাশি রাখলে এই অসঙ্গতি স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিছুকাল আগে বাংলার এই পটুয়া সম্প্রদায় তাঁদের পটচিত্র সহিত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছিল।[১০] ইতিপূর্বে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কালীঘাটের পট ছাপাখানার প্রতিযোগিতায় তার গৌরব হারিয়ে ফেলে এবং বিশ শতকে এসে তা বলতে গেলে লোপ পায়। মুর্শিদাবাদের পটুয়া শিল্পীদের পটশিল্পও এখন অবলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পটুয়া শিল্পীরা তাদের পটচিত্র নিয়ে লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত হয়েছে। সরকারি সাহায্য এক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। তাদের শিল্পচেতনা পালটেছে। এদের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রবণতা আবির্ভূত হয়েছে। এখানকার পটুয়ারাও আগে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পটচিত্র দেখাত। এখন তার কদর কমায় এরা বছরের বেশীরভাগ সময় বিভিন্ন মেলায় দোকান দেয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের পটুয়াদের মধ্যে মেলায় যাওয়ার প্রবণতা কম। শিল্পের গরিমা রক্ষা করতে প্রাকৃতিক উপাদানের পরিপূর্ণ ব্যবহারের কথা তারা বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবটা বুঝতে হবে। এখন আর প্রাকৃতিক উপাদান আগের মতো সহজলভ্য নয়। আবার কিছু জিনিস যেমন ভুলোকালি সহজলভ্য হওয়ায় এবং ময়দার আঠা সহজে তৈরি হওয়ায় মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রে সেগুলির ব্যবহার চোখে পড়তে পারে।[১১]

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পটুয়া নারীরা বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত। মুর্শিদাবাদ জেলার বেশিরভাগ পটুয়া মহিলারা যেমন বাড়িতে তালাই বোনেন। মূলত খেজুর পাতার তালাই তারা বুনে থাকেন। আবার কখনও কখনও তাদের নারকেল পাতার তালাই বুনতেও দেখা যায়। এই জেলার অধিকাংশ পটুয়া পরিবার গরু পালন করে। পটুয়া

মহিলারা গোয়াল কাড়ার কাজ করেন। ছাতিনা কান্দির পটশিল্পী প্রশান্ত পটুয়ার শাশুড়ি মা চিনি পটুয়া ও দিদিমা আনু পটুয়াকে নারকেল পাতার তালাই বুনতে দেখা যায়। তবে বেশিরভাগ পটুয়া মহিলাকে খেজুর পাতার তালাই বুনতে দেখা যায়। যেমনটি মুর্শিদাবাদের করবেলিয়া গ্রামে, আমলাই গ্রামে বা পাঁচথুপি গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাজার দিঘীর পাড়ের আনু পটুয়া, চিনি পটুয়াদের নারকেল পাতার তালাই বোনার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে।[১২] তবে তারা শুধু নারকেল পাতার তালাই-ই বোনেন না, খেজুর পাতার তালাইও তারা বুনে থাকেন। নারকেল পাতার তালাই তারা বাজারে প্রায় ৬০-৭০ টাকায় বিক্রি করেন এবং খেজুর পাতার তালাই প্রায় ১০০ টাকায় বিক্রি হয় (২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের হিসাব)। আগে ছাতিনা কান্দির পটুয়া মহিলারা সানা তৈরির কাজ করত। কিন্তু এখন আর সানা বাঁধার কাজ এই গ্রামের পটুয়ারা করেন না। যদিও মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপির লুৎফুন পটুয়া এখনও সানা বাঁধেন।[১৩]

বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, পট, পটুয়া ও নারীসমাজ সম্পর্কিত সাহিত্যিক উপাদানগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের দুই-তিনটি জেলার পটুয়াদের কথা বলা হয়েছে। যেমন পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার পটচিত্র ও পটুয়াদের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। উনিশ শতকের কালীঘাটের পটুয়া সম্প্রদায় ও তাদের চৌকো পটের কথাও গুরুত্ব পেয়েছে। এমনটা বলা হয় যে, কালীঘাটের পট ছিল বাংলার পটুয়াদের নিজস্ব সৃষ্টি। শ্রীপান্থ তাঁর বটতলা (আনন্দ) বইয়ে লিখেছেন, বটতলার কাঠখোদাই কালীঘাটেরই রকমফের মাত্র। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি চাহিদা মেটাতে কালীঘাটের শিল্পীরা লিথোগ্রাফের দিকে ঝুঁকেছিলেন বলে জানা যায়।[১৪] আলোচনা সাপেক্ষে এই নিবন্ধটিতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পটুয়া নারীদের অবস্থা এবং বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী পটুয়া নারীদের মধ্যেকার বিভিন্নতাকেই তুলে ধরা হয়েছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের কিছু পটুয়া নারী তাদের পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য যেমন আঁকড়ে আছেন, গৃহস্থের কাজ করার পাশাপাশি তারা পটশিল্প চর্চা করেন, তেমনই সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেককিছু তাদের হাতছাড়াও হয়ে গেছে, যা ফিরে পাওয়া দুষ্কর।

সূত্রনির্দেশ :

১. পূর্ব মেদিনীপুরের খুকুরানী চিত্রকর, মৌ চিত্রকর কিংবা পশ্চিম মেদিনীপুরের রানী চিত্রকর, রাধা চিত্রকর প্রমুখ পটুয়া নারীরা পটচিত্র এঁকে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং তারা জড়ানো পটের গানও জানেন।
ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ নয়াগ্রাম, থানা - পিংলা, পোঃ নয়াগ্রাম, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১৪০, তারিখ - ১৫ নভেম্বর ২০১৯; স্থান - নয়া গ্রাম।

২. **ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ** মুর্শিদাবাদ জেলার আও গ্রাম, আয়রা গ্রাম, করবেলিয়া গ্রাম, ছাতিনা কান্দি, আমলাই, গোকর্ণ প্রভৃতি গ্রামের পটুয়া পাড়াগুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, সেখানকার পটুয়া সম্প্রদায় যথেষ্ট আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন গুজরান করে এবং সেই জেলার পটশিল্পের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক।

৩. পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া সম্প্রদায় পটের গান সহযোগে পটচিত্র প্রদর্শনকে চলতি কথায় 'পট খেলানো' বলে থাকেন।
সাক্ষাৎকার : সুকুমার চিত্রকর, বয়স - ৩৫ বছর, পেশা - পটচিত্র আঁকেন, মেলায় পটচিত্রর দোকান দেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা - চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত; আর্থিক স্তর - নিম্ন মধ্যবিত্ত; ঠিকানা - হবিচক গ্রাম, থানা - চণ্ডীপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৫৬; তারিখ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬, স্থান - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্তশিল্প মেলা (২০১৬-১৭),

মেলা প্রাঙ্গণ, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ, নদিয়া।

৪. **সাক্ষাৎকার :**

(ক) কণিকা পটুয়া, বয়স - ৪১ বছর; পেশা - আই সি ডি এস সহায়িকা, গৃহবধূ; শিক্ষাগত যোগ্যতা - অষ্টম শ্রেণি; আর্থিক স্তর - নিম্নবিত্ত; ঠিকানা - আমলাই পশ্চিম পাড়া, থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০১, তারিখ - ২৯ ডিসেম্বর ২০২২, স্থান - আমলাই।

(খ) ববি পটুয়া, বয়স - ৩৮ বছর, গৃহবধূ; শিক্ষাগত যোগ্যতা - তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত; আর্থিক স্তর - দরিদ্র; ঠিকানা - গ্রাম ও পোঃ গোকর্ণ, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৬, তারিখ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২২, স্থান - গোকর্ণ।

(গ) অনিতা পটুয়া, বয়স - ৪৯ বছর, গৃহবধূ; শিক্ষাগত যোগ্যতা - চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত; আর্থিক স্তর - নিম্নবিত্ত, ঠিকানা - আও গ্রাম, থানা - খড়গ্রাম, পোঃ দেবী পারুলিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৩১২৪৪, তারিখ - ২৪ ডিসেম্বর ২০২২, স্থান - আও গ্রাম।

৫. David J. McCutchion লিখেছেন, *In the recent period the impact of the oleographs has been only part of a total economic transformation which has destroyed the very foundations of patua life. Two immediate forms of degeneration set in : (1) an attempt to compete with the oleographs in garishness; (2) loss of conviction leading to hasty and clumsy technique.*
David J. McCutchion, Recent Developments in Patua Styly and Presentation, in David J. McCutchion and Suhrid K. Bhowmik, *Patuas and Patua Art in Bengal*, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1999, p. 37.

৬. **সাক্ষাৎকার :** চারকড়ি পটুয়া; বয়স - ৭৩ বছর, পেশা - অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, এখন লোক আদালতে কাজ করছেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্কুল ফাইনাল পাস, আর্থিক স্তর - মধ্যবিত্ত, ঠিকানা - আও গ্রাম, থানা - খড়গ্রাম, পোঃ দেবী পারুলিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৩১২৪৪; তারিখ - ২৪ ডিসেম্বর ২০২২; স্থান - আও গ্রাম।

৭. **ক্ষেত্রসমীক্ষা** : আও গ্রাম, থানা - খড়গ্রাম, পোঃ দেবী পারুলিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৩১২৪৪, তারিখ - ৭ কার্ত্তিক ১৪২৩ ব., সোমবার (১৮.০৩.১৬); ১০ চৈত্র ১৪২২ ব., বৃহস্পতিবার (২৪.০৩.১৬); ১৭ চৈত্র ১৪২২ ব., বৃহস্পতিবার (২৪.১০.১৬); ১৮ চৈত্র ১৪২২ ব., শুক্রবার (০১.০৪.১৬)।

৮. **ক্ষেত্রসমীক্ষা** : নয়া গ্রাম, থানা - পিংলা, পোঃ নয়া, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১৪০; তারিখ - ১৫ নভেম্বর ২০১৯, স্থান - নয়া গ্রাম।

৯. **সাক্ষাৎকার** : মণি চিত্রকর, বয়স - ৪২ বছর, পেশা - পটচিত্র আঁকেন, মেলায় পটচিত্রর দোকান দেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা - নিরক্ষর; আর্থিক স্তর - নিম্ন মধ্যবিত্ত; ঠিকানা - গ্রাম ও পোঃ নয়া, থানা - পিংলা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১৪০, তারিখ - ১৫ জানুয়ারি ২০১৬; স্থান - নদিয়া জেলা হস্তশিল্প মেলা (২০১৬), মেলা প্রাঙ্গণ, সি এম এস স্কুল ময়দান, নদিয়া।

১০. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, সূত্রাপুর, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন ২০০৮, পৃ. ৪৪৭।

১১. **ক্ষেত্রসমীক্ষা** : করবেলিয়া গ্রাম, পোঃ কাঁতুর হাট, থানা - বড়ঞা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৪২; তারিখ -

২৮ ডিসেম্বর ২০২২।

করবেলিয়া যেতে হলে বাসে করে জালি বাগান স্টপেজে নামতে হবে। বহরমপুর থেকে সড়কপথে প্রায় ১৯ মাইল এবং কান্দি থেকে সড়কপথে প্রায় ১০ মাইল রাস্তা। বাস থেকে হাঁটা পথে গ্রামের ভেতর ঢুকতে হবে। বাঁশবাগান এলাকায় গ্রামের পটুয়াদের বসতি।

১২. **ক্ষেত্রসমীক্ষা** : রাজার দিঘীর পাড়, ছাতিনা কান্দি, পোঃ কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৭, তারিখ - ২৬ ডিসেম্বর ২০২২।

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কান্দি বাসস্ট্যাণ্ড প্রায় ৩০ কি.মি. পথ, বাসে যেতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। সেখান থেকে গ্রামের ভেতর প্রায় আড়াই কি.মি. গেলে রাজার দিঘীর পাড়ে গ্রামের বেদে পটুয়ারা বসবাস করে।

১৩. **সাক্ষাৎকার** : লুৎফুন পটুয়া, বয়স - ৫৫ বছর, পেশা - সানা বাঁধার কাজ করেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা - নিরক্ষর; আর্থিক স্তর - নিম্নবিত্ত; ঠিকানা - পাঁচথুপি (ভাটপাড়া), পোঃ পাঁচথুপি, থানা - বড়ঞা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬১; তারিখ - ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯; স্থান - পাঁচথুপি।

১৪. আনন্দবাজার পত্রিকা ৯৭ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা সোমবার ২৫ চৈত্র ১৪২৪ কলকাতা, সম্পাদক - অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৪।

দীপাঞ্জন দে
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

Harmonizing Two Horizons : Literature and Medicine in Poetry of John Keats

Yogesh S. Kashikar

Abstract :

Literature is a product of experience and expression. Good literary works mirror the society and make suggestions for social correctness. The writer should artistically present the reality of his society and point the way forward to higher ideals and more humane options. As a way of conveying social reality, writers explore biological, socioeconomic and cultural dimensions of human health and medical practice. Literature and medicine, as an interdisciplinary study, shows the social function of literature which lies at the intersection of humanities, medicine and social sciences. Since illness and medical experiences are daily encountered in our society, writers' exploration of such health conditions attests, significantly, to their consciousness of societal depravities and commitment for social and human improvement. The intricate web woven between literature and medicine has yielded fascinating insights into the human condition, illuminating both the physiological and emotional facets of existence. This nexus, often overlooked, finds a remarkably harmonious embodiment in the poetry of John Keats, a remarkable literary figure whose legacy extends beyond his verses and delves into his experiences as a trained surgeon's apprentice. This introductory section seeks to shed light on the significance of investigating the confluence of literature and medicine in Keats' poetry and the unique insights this union brings to the fore. This research paper delves into the intricate interplay between literature and medicine within the poetry of John Keats. It examines how Keats intricately weaved elements of medical knowledge and human experience into his poetic works. The paper explores how Keats's exposure to medical training and his poetic vision converged, resulting in a unique perspective that resonates through his portrayal of characters and themes in his poetry. By investigating Keats's engagement with both medical knowledge and artistic expression, this paper seeks to shed light on the ways in which literature and medicine harmonized in his creative process.

Keyword : Literature and medicine, Medical Humanities, healthcare, empathy, pain, suffering, illnesses, Health Humanities and mortality

---

S. Kashikar, Yogesh : Harmonizing Two Horizons : Literature and Medicine in Poetry of John Keats
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 2, Dec 2023, Pages : 55-67, ISSN 2249-4332

Introduction

Health Humanities or Medical Humanities is an interdisciplinary approach to find the relationship between literature and medicine. Since human health is very significant in the overall social activities of human beings, writers' imagination and exploration of experiences that border on physical and psychopathological condition attests to the social function of literature. Its primary aim is to acquaint all with the representation of pathological conditions–physical and mental-in literary texts. The creation of characters, suffering from pathologies- physical or mental- is a creative perspective that is anchored on social behaviours. The writer invented his ailing characters and the incident surrounding their health conditions from the society. The writer's universe is constructed from the universe inhabited by people of life and blood. Sometimes ailment is sometimes deployed as a metaphor for political and economic convulsion. By integrating disciplines such as literature, philosophy, ethics, history, and the arts into the context of medical practice and education, Medical Humanities seeks to enhance the understanding of healthcare experiences and foster more compassionate and holistic patient care. This field recognizes that the practice of medicine goes beyond the technical aspects of diagnosis and treatment; it encompasses the lived experiences of patients, the ethical dilemmas faced by healthcare professionals, and the societal and cultural influences on healthcare systems. Through engaging with literature, art, and narratives, healthcare practitioners develop greater empathy, communication skills, and self-awareness, enabling them to better connect with patients and understand their perspectives. Moreover, Medical Humanities provides a space for critical reflection on the ethical complexities inherent in medical decision-making and encourages a deeper exploration of the human dimensions of health and illness. As a result, the integration of Medical Humanities enriches medical education and practice by promoting a more comprehensive and patient-centered approach to healthcare.

The relationship between medical and the artistic culture has been traced back for centuries. In the classical Greek society, for instance, Apollo is acclaimed as the god of medicine and poetry. In the same vein, Hippocrates, the Greek philosopher and physician, is reputed as the father of medicine and the originator of the 'case note tradition' through which physicians record, comment or narrate their observation of patients' ailments. Aristotle, a contemporary of Hippocrates, also played a significant role in the evolution of medical thought through his literary, philosophical narratives. Best examples can be found in Poetics where Aristotle also has some prominent narratives on the biological composition of man, which help to create a significant link between the humanities and medical science.

It is an academic specialty that examines the literary representation of human's pathologies and healing, medical ethics and other experiences that border on human health and biomedical experiences. It also highlights the role of literature in narrating

ethical issues in the medical profession. It also creates awareness on different human health situations through the instrumentality of literary expression. It exposes many creative works by physician-writers, patient-writers and non-physician writers that convey experiences of physical and mental suffering as well as ethical issues, treatment and healing. There are many physician-writers whose works are indispensable in medical humanities across the globe like John Keats, Tobias Smollet, George Buchner, Anton Chekhov, Arthur Conan Doyle, Arthur Schnitzler and William Carlos William, Oliver Goldsmith, Allen Richard Seltzer, Sir Geoffrey Keynes, Samuel Shem,Sigmund Freud, A. J Cronin, Michael Crichton, Paul Carson, AneziOkoro, LatundeAdeku, Wale Okediran, ToluAjayi, Femi Oyebode, MarthinAkpaa, EghosaImasuen, and many others.

John Keats, renowned for his exquisite imagery, sensual language, and profound explorations of beauty and mortality, stands as one of the leading figures of the Romantic movement. However, an aspect of his life that is less frequently discussed is his medical background. Prior to fully dedicating himself to his poetic pursuits, Keats embarked on a medical journey, immersing himself in the world of medicine as an apprentice to Thomas Hammond, a licensed surgeon and apothecary. This dual role that Keats inhabited as both a burgeoning poet and an apprentice to medicine forms the foundation upon which the interplay between literature and medicine in his poetry is built.

The relationship between literature and medicine has often been viewed from a dichotomous perspective-where one delves into the realms of imagination and artistic expression, and the other into empirical observations and scientific analysis. However, Keats' works offer a compelling testament to the fact that this dichotomy is far from absolute. Rather, it is a dynamic intersection where the realms of literary artistry and medical understanding converge in nuanced and enlightening ways. Keats' engagement with medicine not only infused his poetry with a distinct blend of knowledge and sensitivity but also enriched his medical understanding with a heightened awareness of the human experience.

In exploring this convergence, we are presented with a unique opportunity to delve into the depths of Keats' poetry, extracting layers of meaning that are often obscured by traditional literary analysis. His poems reveal a meticulous intertwining of medical insights with lyrical brilliance, wherein human emotions and physiological realities find an evocative resonance. As we embark on this exploration, it becomes evident that Keats' familiarity with medicine enabled him to craft verses that encapsulate the fragility of the human body and soul, as well as the transcendence that artistic expression can offer.

This research endeavors to unravel the intricate threads that Keats wove between literature and medicine, illuminating how his poetic narratives resonate with the human condition on both physiological and emotional planes. By delving into his poetic works, we aim to unveil how Keats' unique vantage point as a poet and a medical apprentice

allowed him to create a body of work that harmonizes these seemingly disparate horizons. Through his verses, Keats not only captures the essence of the human experience but also offers a lens through which we can perceive the interconnectedness of literary creativity and medical observation. In the pages that follow, we will explore selected poems that exemplify this harmonious fusion, shedding light on the myriad ways in which literature and medicine entwine within Keats' poetic universe.

Research Methodology

The methodology which is applied in this research is thematic and qualitative analysis. The thematic analysis is one of the most popular qualitative data analysis techniques used in social sciences, literary studies, psychology and health sciences. It requires in-depth textual analysis. It emphasizes the role of context in understanding the text. It involves the use of all sorts of data. Qualitative analysis also looks at what language does and how it is used in the text; it is a sort of discourse analysis. Examining the thematic analysis of Literature and medicine in Keats will allow us to have better understanding of Keats's expression and points of view towards life and society.

Early Medical Education Shaping Keats's Poetic Sensibility

Keats' medical education was extensive and comprehensive. To comprehend the interwoven connection between literature and medicine in Keats's work, it is imperative to delve into his initial venture into the medical realm. This exploration reveals how Keats intertwined literature and medicine, showing how his poetry connects with the human experience, both physically and emotionally. By exploring Keats' personal journey in medical education, we can also discover his unique views on the blend of medicine and poetry. After the death of his mother in 1810, John Keats was sent to apprentice and learn medicine under a well-known apothecary, Thomas Hammond in 1811. Hammond was the family doctor and neighbor.

Soon John Keats moved in with Hammond and lived in the attic above the surgery for four years. During this time, he learned various tasks like bleeding, vaccinating, treating wounds, setting bones, extracting teeth, and applying treatments like leeches, cups, and poultices. This training was typical for someone aspiring to be an apothecary or apothecary-surgeon. After receiving his apothecary's license on July 25, 1816, he spent a few months at Guy's Hospital, studying and working as a surgeon's dresser. During this period,he learned how to diagnose and cure sickness and conduct minor procedures. Keats also studied a variety of scientific subjects, from chemistry and physics to biology and physiology. Keats's lecture notes cover a wide range of medical topics, from exact measurements of the body to more abstract ideas. The knowledge of pharmacology, medical botany, and the methods of experimental surgery and chemical treatments practiced on most of the patients have shaped his early life and poetic

sensibility. As for the impact of medical training on Keats's poetry, many critics investigated the strong connection between the two professions. It is true that Keats abandoned the profession of medicine in favor of poetry soon after obtaining his medical license; he continued to consider that a poet and a medical practitioner are morally connected. He saw poetry as a potential therapeutic agent. It is quite evident that many medical terms that he took from his courses and patients' situations, symptoms, and solutions can be found very clearly in his poetry. Working as an apothecary gave him many ideas for his often mixed-up pictures, which he uses in his important poems either knowingly or without realizing it. Instead of leaving behind his scientific background, he decided to begin his journey as an artist. He made sure to keep his old medical books and often referred back to them. These early readings became the foundation of the extraordinary connection between medicine and poetry seen uniquely in British Romanticism through his work. When reading and studying Keats's poems, it is crucial to remember that he was also a physician. Through the medium of poetry, Keats seeks relief from his bodily and mental suffering. For Keats, poetry serves as a conduit and a method of treatment. Psychotherapy sessions appear often in his poems. Moreover, Keats had extensively read Burton's Anatomy of Melancholy and he drafted some of his famous poems of the pages of the book such as Ode to Psyche (White, 2022, p.4). Keats in his poem stated that, a poet is "A humanist, Physician to all men." (The Fall of Hyperion, I. I89-I90). After abandoning his career in medicine, Keats considered poetry to be a type of medicine or a method of self-improvement (Epstein, 1999, p. 55). His belief that poetry could heal and address ailments when medical science fell short was a significant aspect of his idea of a poet as a healer. He thought that poetry had the power to comfort, heal, and mend the pain and distress of others. Recognizing these parallels, Keats envisioned the potential of merging medical study and emotional poetry, bridging theory and practice. In this regard, Keats follows a tradition of writers and doctors that includes Rabelais, William Carlos Williams, Tobias Smollett, and, notably, Anton Chekhov. In fact, Keats is one of the few medically trained authors who never practiced medicine. Evidently, his medical background aids his artistic ability to clearly express death and suffering. His medical experience is converted into emotional art. While searching through Keats's poetry, every now and then a medical ring may be heard in some of his poems. Keats used pictures, concepts, and sometimes even the technique, the method of thinking about things that he had learned during his medical studies.

The Impact of Medical Training on Keats's Poetic Vision

Keats's medical training significantly influenced how he saw poetry. With his knowledge of the human body and its vulnerabilities, his medical background gave him a special skill to talk about things like death, suffering, and the complex parts of life. This skill

helped him describe death and pain in his poems with real feeling and truth. He turned his medical ideas into art, using words and ideas from medicine in his poems. Ultimately, Keats's capacity to combine the scientific and the emotional, through his mastery of both medicine and poetry, enriched his work with a profound and enduring depth that continues to captivate readers across generations. Keats's medical knowledge and practice provided him with images to describe many of his personas and their physical and mental suffering in a medical way.

Although he abandoned medicine as a career, Keats could not easily forget what he had heard and seen and learnt during his six years of training. Keats's medical training also introduced him to certain images, metaphors, ideas, and ideals, which, as part of his intellectual equipment, would inevitably find their way into his poetry and letters. It remains to be shown how his knowledge of chemistry, botany, anatomy, physiology, pathology and medical influenced Keats in his new career as a poet. Keats's attitudes towards experimental proof and towards the use of analogy, however, were ambiguous. As a poet, he inevitably made extensive use of analogy, speculated at length about life, and insisted on the primacy of the imagination in grasping truth.

Keats adapted certain chemical terms and theories as metaphors to explain his ideas concerning the creative process of writing poetry. Since medical chemistry is largely concerned with describing processes of change, combination, decomposition, and refinement, it is easy to recognize how Keats saw these processes as analogous to what occurs when the imagination works on various ideas, sensations, and emotions to produce poetry.

After getting a degree and being fully capable in medical practice, he gave importance to the depiction of thoughts and feelings and serve the humanity through halo of his writings, for he knew that the mental hurts harm much and hamper the emotional growth. He is of the view that poetry can heal distressed soul and depressed mind where as a physician deals with physical states. Like a good mentor, a poet prescribes different poetic prescriptions seeing the intensity of agony of mentees. Seeing the situation, he becomes a sage and philosophises life, sometimes he assays the role of a humanist to give balm to distressed and depressed souls and at occasions, turns out to be a physician to heal the mental scars of the readers. His poetry instills a hope in dreary life of people to lead a very joyous life. His poetry has the potential to trounce the devil of despair and duress. He is of firm conviction that pain is universal and strikes all at one pretext or the other. The chief aim of poetry is to serve the ailing mankind. What a poet has to do, just to guide and goad his readers and heal their woes. In his famous poetic treatise "The Fall of Hyperion" (1819), he defines the objectives and goals of a poet in following alchemy of words :

In sickness not ignoble, I rejoice,
Ay, and could weep for love of such award.'

So answered I, continuing, 'If it please,
Majestic shadows, tell me: sure not all
Those melodies sung into the world's ear
Are useless : sure a poet is a Sage;
A humanist, Physician to all men

John Keats illustrates his poetic creed and the role of a poet in the world in his treatise "Hyperion" (1819). The poem presents a panacea for human sufferings in the abstractions of poetry. The poem is weaved around the theme of war between Titans and Olympians-two dynasties of Greek gods, the defeat of son-god Hyperion and usurpation of the throne by Apollo. The warfare between Hyperion and Apollo symbolises the role of the poet to heal human pain. In "The Fall of Hyperion: A Vision", Canto I, John Keats refer Greek goddess Mnemosyne as Moneta, and shows her to safeguard the Saturn's temple. The protagonist of the poem comes to Moneta's temple to heal his dilemma, she exhorts him that his ailment can be cured by empathizing with the pains of humans. Those who are gifted with this notion are blessed in the temple to be transformed into a poet, poetry can end human miseries. Keats in the poem predicts that free souls can dream but power lies in the mind of the poet who can transfix his imagination into an enthralling piece of verse, and thereby sublimating fumes of furies. The following lines ensconce the poet's proactive role in healing the wounds of sufferers :

Art thou not of the dreamer tribe?
The poet and the dreamer are distinct,
Diverse, sheer opposite, antipodes.
The one pours out a balm upon the world,
The other vexes it.

In the poem, he presents a testament on functions of poetry, and leaves onus on the poet to balm human's sufferings. Moneta, the priestess, mother of muses, charms the protagonist with her spells and exhorts to get blessings only through his resolve to end the human predicament. The true obeisance to her is to share the grief with one another, and troubleshooting the problems and plight of the fellow humans. She emphasises that poets should give shoulders to the pain of sufferers through verses. He endeavours to build an interface between art and life. Keats draws an analogy in the poem between active and passive dreamy mind; and between creative potential of the poet and the inert dreamer. Mark the melody of the lines reminding the duty of a poet :

My power, which to me is still a curse,
Shall be to thee a wonder, for the scenes
Still swooning vivid through my globed brain,
With an electral changing misery,

Thou shalt with these dull mortal eyes behold
Free from all pain.

John Keats' preoccupation with medical science enables him to evolve mastery over the use of medical terms to size up the ecstasy and agony of the people. His medical profession arms him with a force to enrich his poetic language like prescriptions, idioms, metaphors and symbols to show the intensity of the disease and mental state of the readers.

In the poem "Hyperion", he uses the term 'fever' thrice much talked about word in medical field. His allusion by using the term 'fever' is to denote the mental anguish of Saturn by tasting the defeat by Jupiter. The same strategy, he applies in "The Fall of Hyperion" to show the spectacle of miseries and psychological state of the fallen Titans. He employs the medical words "clod", "palsied chill', "spleen", "nest of woe", "appetite", "flesh", bones", "sickness", "globed brain", "medicine", "fear", "despair", "convulsion", "pain of feebleness" etc. In the second book of "Hyperion", Keats uses medical metaphors to show the physical and mental state of the defeated god Saturn. Like an adept poet-physician, he tells his readers that fever which is the most occurring diseases may increase the temperature of the body causing physical effects, but negative thought pillages the calmness of the mind. Hyperion's tender spouse Thea consoles her husband telling him that Saturn's precarious position is due to his mental turmoil and forbids him not succumb to negative thoughts. Mark the following lines of poem "Hyperion" (Book II) extending comfort to fury of the mind:

Then Thea spread abroad her trembling arms
Upon the precincts of this nest pain,
And sidelong fixed her eye on Saturn's face:
There saw she direst strife; the supreme God
At war with all the frailty of grief,
Of rage, of fear, anxiety, revenge,
Remorse, spleen, hope, but most of all despair.
Against these plagues he strove in vain

Thea, the Greek goddess of sight and vision, is represented as a female nurse for Saturn who had lost his kingdom to Jupiter. In writing Hyperion, Keats has used a lot of medical knowledge to describe the dilemma of the Titans and their falling state. Keats was also nursing his dying brother (Tom) by the time he was writing the poem. This may explain some of the medical allusions contained in the text and may also explain the importance of the role of nurse exercised by Thea.

John Keats prescribes that poetry can act like medicine. Keats saw through his own eyes the tragedies occurring in his family, he understood and felt the pain, physical sickness and mental anguish stemming from their sufferings. Images of sickness and

illness contributed to his poetic imagination.

In some of Keats' poems, he explores the scientific and medical culture, including physical and mental pathologies. He privileges the therapeutic power of imagination over bioscientific invention and medicine. In "Ode to Nightingale", he showcases the power of poetry to heal the woes, and feel its therapeutic effects. The poem was composed by Keats just after the loss of his loving brother Thomas. The poem draws an analogy between the ecstasy, mirth and buoyance of the bird and the pangs of human sufferings and sorrows. When he hears the song of the garden of his friend Brown, he feels sedated by charm of the voice as the intoxication of hemlock. He uses the name of a medicine 'opiate' that was used as a pain reliever at that time. The poem illustrates the mortality of humans and the temporariness of joy, youth and beauty, and, moreover, the immortality of art and poetry. He injects a dulcet dose of beauty in art. Mark the following lines of the poem" Ode to Nightingale "offer some significant therapeutic effect :

The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown:
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when sick for home,
She stood in tears amid the alien corn

In 'Ode to a Nightingale', Keats unfolds the redemptive power of poetic imagination to mental health. The poet, who was nursing traumatic memories, heard the soothing rhythm produced by a nightingale, which takes away the poet's feeling of mental distress. Keats, in the poem, believes that through the power of artistic beauty and imagination, one could receive mental recuperation. The beautiful rhythm generated by the sound made by the nightingale bird, and what Keats perceives as the songbird's happy mood, elicit his own mood of joyous elation :

My heart aches, and drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk
Or emptied some dull opiate to the drains
… … … … … … … … … …
Tis not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thine happiness,
That thou, light-winged Dryad of the trees
In melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease.

The poet admires the joy of the nightingale which contrasts sharply with his experience of pain and mental depression. The nightingale's song makes him feel as though he has

drunk 'hemlock' or 'emptied some dull opiate to the drain'. Opiate, sometimes called narcotics, are drugs prescribed to relieve pains. Keats believes that the consumption of the nightingale's song is like a medicine that takes his mind away from the troubles of this world. Keats' narration of human's suffering and mortality in the poem conveys the contrast between the despairing world of human beings and the soothing, natural world of the bird.

"Lamia" is a beautiful poem demonstrating a serpent who transforms into a beautiful woman "full of silver moons" and "eyed like peacock", showcases poet's preoccupation with chemistry. She is blessed to have love of an Athenian youth, but is disgruntled at marriage feast by bald headed and ferocious philosopher. She is a sorcerer and also the victim of sorcery. She builds a pristine palace by her magic for her lover, but their bliss is blotted by the philosopher. Her transformation is not full of jocundity but with thorns, pains and paleness of human mortality. Keats describes her pain scarlet and her transition painful. The poem is inundated with medical metaphors like "mouth foamed, "flashed phosphor", "convulsed", "scarlet pain" etc. His poems are full of healing vigour and act as a medicine to assuage the sufferings of Homo sapiens. Mark the therapeutic effect of the following lines of the poem" Lamia":

> But God fostering her chilled hand,
> She felt the warmth, her eyelids opened bland,
> And, like new flowers at morning song of bees,
> Bloomed, and gave up her honey to the lees

As a trained medical doctor, taking up the vocation of literary imagination, Keats explores experiences that border on illnesses, diseases, death and recoveries. Keats' exploration of pathological conditions is based on his personal experiences of illnesses, suffering and mortality. John Keats conscientiously endeavours to evolve a relation between pain, relief and identity through the entity soul. In the poem "Ode to Psyche", he expresses his devotion to Psyche, a king's daughter was united with her lover, Cupid, the god, after bearing the slings of fortunes. Keats like to worship as he finds to approach to immortality through the most striking entity of human soul, the imagination. Psyche was the by-product of imagination to replenish the gap between the mortal and immortal. In the charming poem "The Eve of St. Agnes", Porphyro's desire to cure the pain of his soul by drowsing in lap of lady, Madeline. In "Isabella", the poet finds a correlation between pain and soul by depicting the pain of the soul of slain Lorenzo finding solace in freedom from loneliness. The very popular poem is treatise on the relation of soul and pain. Keats read Robert Burton's book "The Anatomy of Melancholy" and was highly influenced with the notions inscribed therein. The message the poem affords is that melancholy in an inherent malady in us. The poem elucidates that pleasure and pain are intertwined together and tethered with the awakening anguish of the soul. He

exerts emphasis on soul making. John Keats, a poet-physician underlined the role of poetry to balm the sufferings of humanity. He wants to drown in the charm of natural beauty but he must forsake it to probe reasons behind the agony and strife of human hearts, and anoint the balm of healing on the brow of their aching souls. The lines of the poem "Sleep And Poetry" exhibits its therapeutic effects:

We rest in silence, like two gems upcurled
In the recesses of a pearly shell
And Can I ever bid these joys farewell?
Yes, I must pass them for a nobler life,
Where I may find the agonies, the strife
Of human hearts : for lo! I see afar.

Summing Up

In conclusion, we may assert that John Keats was a poet-physician who nursed and nourished the suffering humanity. He extended relief, relaxation and recovery to the bruises of depressed and distressed minds. His poetry diminishes and devours our sorrows, sadness and severity. He was of the firm conviction that poetry reading, writing, listening is a panacea for the emotional losses of the people. He wrote poetry to improve and elevate human conditions. His preoccupation with medical profession gave him a force to heal the mental anguish of the people. He employs miraculous medical metaphors to depict negativity and mental disorders. He lets his readers to identify their problems with anguish of his characters of the poems, and thus creating therapeutic effects on their ailments. The mental agony was spliced and comprehended within the corporal of physical pain emanated from feelings and emotions ensconced during illness. By melting his medical knowledge into the ice of poetry, he evolves drops of frost to soothe the feeble senses.

Keats always hoped to write poetry that would profoundly improve the human condition. From the first account of the poet as a "physician" in Hyperion, to the development of his own poetics of negative capability in the 1819 spring odes, he continued to wish his works might be of some benefit to his audience.Keats's mature works test the notion that identity can be shaped by pain and express the idea that the pain that creates identity is the proper vehicle of poetry. As the proper vehicle of poetry, this pain can also be beautiful. But beauty is no palliative; poetry should not attempt to aestheticize pain into pleasure for its own sake.

Bibliography

1. Banerjee, A., (2002). Female Voices in Keats's Poetry. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.
2. Chavis, Geri Gieben. "Poetry and Story Therapy : The Healing Power of Creative Expression". Jessica Kinsley Publishers
3. Dana, CL (1916). Poetry and the Doctors: A Catalogue of Poetical Works Written by Physicians. Elm Tree Press, Woodstock, VT1916
4. De Almida, H. (1991) "Romantic Medicine and John Keats". Oxford University Press, p.138
5. Epstein, Joseph.(1999) The Medical Keats. The Hudson Review. Vol. II. No. 1. Apr.
6. Evans, G., (2002) Poison Wine : John Keats and the Botanic Pharmacy- The Keats-Shelley Review, 16(1), pp. 31-55.
7. Everest, K. (2004). 'John Keats (1795-1821)'. Oxford Dictionary of National Biography, Online Edition.
8. Ghosh, H., (2020) Keats at Guy's Hospital: Moments, Meetings, Choices and Poems. London: Palgrave Macmillan.
9. Gittings, R. (1973). 'John Keats, physician and Poet'. JAMA. 224: 51-55
10. Goodman, W.R. (1968) A History of English Literature. Doabra House. Booksellers and Publishers. NaiSarak, Delhi..
11. Homans, M., 1990. Keats Reading Women, Women Reading Keats. Studies in Romanticism, 29(3), pp. 341-370.
12. http://www.eng-poetry.ru/english/Poem.php?PoemId=831 downloaded on 13/05/2023
13. http://www.john-keats.com/gedichte/lamia_i.htm downloaded on 13/05/2023
14. http://www.john-keats.com/gedichte/the_fall_of_hyperion.htm downloaded on 13/05/2023
15. https://poets.org/poem/hyperion downloaded on 13/05/2023
16. Jones, A. H. (1997). 'Literature and Medicine: Physician-Poets'. In: Lancet 349: 275-278
17. Keats, John. (1895) "The Letters of John Keats". Ed. Buxton Forman, Reeves and Turner:. p.17.
18. Keats, John. (1992) "The Poems of John Keats". Everyman's Library, p.357
19. Keats, John. (2002) "The Selected Letters of John Keats". Ed. Gant F. Scott. Harvard.. p.290
20. Kirpikli, D., (2019). The Principle of Beauty: The Gothic in John Keats's Isabella; or The Pot of Basil.. Ankara ÜniversitesiDilveTarih-Co?rafyaFakültesiDergisi,, 59(1), pp. 203-216.
21. Nagar, A. and Prasad, N.A., (2005). Recritiquing John Keats. New Delhi: Prabhat

Kumar Sharma for Sarup & Sons.
22. Osier, W. (1896). 'John Keats-The Apothecary Poet'. In: Johns Hopkins Husp Bull. 7: 11-16
23. Oyebode F. Preface. In: Oyebode F (ed) (2009), Mindreadings: literature and psychiatry. London: RCPsych Publications.
24. Oyebode Femi (2010) The medical humanities: literature and medicine WIDER HORIZONS IN MEDICINE Clinical Medicine 2010, Vol 10, No 3: 242-4
25. Roe, Nicholas. "John Keats and the Medical Imagination". Palgrave Macmillan Publications: Gurgaon.p.27
26. Ruston, S. (2014). 'John Keats, Poet-Physician'. In: Discovering Literature: Romantics and Victorians. British Library, online.
27. Smith, H. (1984). 'John Keats: Poet, Patient, Physician'. Rev Infect Dis. 6: 390-404
28. Sperry, S., (1962). The Allegory of Endymion. Studies in Romanticism, 2(1), pp. 38-53.
29. Ziegenhagen, T., (2002) Keats, Professional Medicine, and the two Hyperions..Literature and Medicine.,21(2), pp. 281-305.

Yogesh S. Kashikar
Professor and Head In English Department
Shriram Kala Mahila Mahavidyalaya, Dhamangaon Rly
Amravati, Maharashtra, India

ISSN: 2249-4332

Journal Guidelines

Submission of Manuscript

All papers must be submitted to journalopeneyes@gmail.com

The corresponding author will get a reply in a return mail. After an initial evaluation, the paper will be sent out for external peer review. While Open Eyes aims to notify authors of acceptance, rejection, or need for revision within three months of submission, the high volume of submissions and demands on referees may not always permit attaining this target evaluation and peer review timeline. Nevertheless, Open Eyes aims to have manuscripts reviewed within six months.

Ethical Responsibilities of Authors

This journal is committed to upholding the integrity of the scientific record. The journal will follow the **COPE** guidelines on how to deal with potential acts of misconduct. Articles submitted for publication must be original, not published previously, and not being considered for publication elsewhere.

No requirement of publication fee

Open Eyes does not require payment from authors to publish their papers in the journal. All submissions undergo the same rigorous process of evaluation and peer review.

Scope of Publication

Open Eyes publishes papers related to the areas of Social Sciences, Commerce and Humanities

Open Eyes Style Guide (For details consult the website)

Submission Format

Articles must be in Bengal or in English (British) with the content arranged as follows :

The first page of the article should contain title of the article; author's complete name, affiliation, and address (omit social titles). Also include an abstract (maximum of 300 words) and Keywords.

The main text will not carry the name of the author and will constitute separate word file. For references use MLA style (8th ed.) (Author-date format).

The length of each article must not exceed 6,000 words. References should be limited to literature cited only in the main text. The manuscript must be submitted as an MS Word file, font size 12, typed 1.5 spaces on A4 paper setting.

Tables, Figures

Each table and figure (accompanied by the original tabulated data) must be on a separate sheet of paper, numbered in order, and placed at the end of the article. To facilitate layout and typesetting, the editable files of the tables and figures will be required when a paper is accepted for publication.

Text for tables should not be smaller than 9 points. Scanned or digital photos should be of high resolution (minimum of 300 dpi).

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 20, No. 2, December 2023

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only